নীল দিগন্ত

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পরিবেশক :

বারীন্দ্রনাথ দাশ
প্রীতিভাজনেষু

'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার ১৩৬৪ সালের শারদীয়া সংখ্যায় এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে মুদ্রণের সময় এতে সামান্য সংযোজন ও পরিবর্তন করেছি।

—লেখক

কলকাতা
১লা আষাঢ়, ১৩৬৫

এক

[বৃহস্পতিবার : দুপুর, বিকেল, সন্ধ্যে]

॥ ১ ॥

বৃষ্টি পড়ছিল।

পাশের কাচের জানলাটা বন্ধ। তবু তার ভেতর দিয়েই বাইরে যথাসাধ্য চোখ ছড়িয়ে দিয়েছিল গৌতম। কাচের ওপর দিয়ে জল গড়িয়ে গড়িয়ে এসে সব ঝাপসা করে দিচ্ছিল—দূরে জি-পি-ওর ঘড়ি আর হাইকোর্টের আবছা চূড়ো যেন জলের তলায় ডুবে থেকে ঢেউয়ে ঢেউয়ে দুলছিল অল্প অল্প, লালদীঘির গাছ-পালার পাশ দিয়ে ট্রাম আর গাড়ির সারি সামুদ্রিক শ্যাওলার ভেতর দিয়ে ভেসে চলেছিল মাছের ঝাঁকের মতো। ঠিক যেন বিলিতি ছবির আণ্ডার-ওয়াটার ফটোগ্রাফি দেখছিল গৌতম।

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বেশ শব্দ করেই। কিছু নস্যির গুঁড়ো ছড়িয়ে পড়ল সামনেকার ফাইলগুলোর ওপর। বাঁ দিকের কানটা কট্‌কট্ করে উঠল একবার। লাল কালির কলমটা তুলে নিয়ে তার গোড়া দিয়ে কানের পরিচর্যা করতে করতে গৌতম আবার নিঃশ্বাস ফেলল। আণ্ডার-ওয়াটার ফটোগ্রাফি। সাউথ-সী আইল্যাণ্ডস্। গ্রীন হিল্‌স্ অব আফ্রিকা (ওই নামে হেমিংওয়ের একটা বই আছে বোধ হয় ?)—ফুলের আগুন লাগা আলাস্কার বনভূমি—ইটালির ব্লু-গ্রোটোর নীল ছায়া মাখানো জল, আকাশ ছোঁয়া রেড্ উড্—

দুত্তোর। নিজের ভৌগোলিক কল্পনাকে ধমক দিয়ে এইখানেই

থামিয়ে দিলে গৌতম। কলকাতা থেকে বাব্বা—কতটুকুই বা রাস্তা। অথচ, এই রাস্তাটুকুই এখনো সে পার হতে পারছে না, ছুটির দরখাস্ত এখনো ঝুলে আছে ত্রিশঙ্কুর মতো। আলাস্কা আর ব্লু-গ্রোটোর স্বপ্নই বটে!

—বৃষ্টি দেখছ নাকি হে?—পাশের টেবিল থেকে ব্রজেন দস্তিদার জিজ্ঞাসা করল।

গৌতম ফিরে চাইল। জবাব দিল না।

—কলকাতার বৃষ্টি কি আর দেখবার মতো? সে দেখতে হলে দেশে যেতে হয়। সুপুরীর বন মাতামাতি করছে, নদী ফুলে ফুলে ফেনিয়ে উঠছে, ইলিশ মাছেরা খুশি হয়ে 'উলাস' দিয়েছে, পুকুর ভেসে গিয়ে গ্রামের রাস্তায় চলেছে মাছের স্রোত, আর গোল-পাতার ছাতা মাথায় দিয়ে—বলতে বলতে ব্রজেন দস্তিদার থেমে গেল। টিনের কৌটো থেকে একটা বিড়ি বের করতে করতে বললে, এখন সব স্বপ্ন হে, আফিংয়ের নেশা!—নিঃশ্বাস ফেলে বললে, দেশই চলে গেল তো দেশের বৃষ্টি।

নেশা—স্বপ্ন। গৌতম ভাবল। ব্রজেন দস্তিদারও নেশার স্বপ্ন দেখছে। আলাস্কা আর পূর্ববঙ্গ—দুয়ের দূরত্বই সমান এখন। কত হাজার মাইল কে জানে!

"পুব হাওয়াতে দেয় দোলা, আজি মরি মরি—
হৃদয় নদীর কূলে কূলে—"

পেছন থেকে চাপা গানের সুর। অনিল মৈত্র। ছেলেটা নতুন—মাসখানেক হল অফিসে ঢুকেছে। ওকে এখনো স্বপ্ন দেখতে হয় না—স্বপ্নের মধ্যেই ডুবে আছে। যাক আরো কয়েকদিন। বিকেল পাঁচটার ক্লান্তি আরো ঘন হয়ে নামুক রক্তে। তারপরে দেখা যাবে। হৃদয়-নদীর জল,' মজে-যাওয়া বিদ্যাধরী হতে সময় লাগবে না।

মাথা নামিয়ে কাজে মন দিতে চেষ্টা করল গৌতম। পড়ুক, যত ইচ্ছে বৃষ্টি পড়ুক বাইরে। এখানে কোনো সুপুরীর বন বর্ষার হাওয়াতে মাতাল হয়ে উঠবে না, এখানে গারো পাহাড় থেকে বুনো হাতির পালের মতো মেঘ নেমে আসবে না হাওরের ওপর। এখানে কেবল বৃষ্টির জলে বিষাক্ত কালো পাঁকের রাশি বয়ে গিয়ে একটু পরেই গঙ্গার জলকে আবিল করে দেবে। তার চাইতে অফিসের খাতাই ভালো।

ব্রজেন দস্তিদার ফের কথা কইল।

—আরে রাখো ব্রাদার, অত সিরিয়াস্‌লি আর চাকরি করতে হবে না। আসল খবর বলো। শনিবারেই তা হলে বেরুচ্ছ?

বৃষ্টি গড়িয়ে নামা কাচের জানলার ওপর আবার চোখ পড়ল গৌতমের।

—বেরুচ্ছি আর কি করে বলি। ছুটিই তো এখনো পাইনি।

—পেয়ে যাবে।

—বুঝতে পারছি না। ছোট সাহেব দিল্লী থেকে না ফিরলে তো কিচ্ছু হবে না। অথচ আজও ফিরবে বলে মনে হয় না।

ব্রজেন ভরসা দিয়ে বললে, না-না, আজ আসবে ঠিক।

—না এলেই বা কে কী করছে—গৌতম বিস্বাদ গলায় বললে, ওদের কী। একটুখানি কাজের ছুতো নিয়ে বোঁ করে উড়ে যাবে—সাতদিন আড্ডা দিয়ে ফিরে আসবে। মোটা টি-এ, মোটা হল্‌টেজ। আর আমাদের? একটু এদিক-ওদিক হলেই 'শো কজ' আর মেডিক্যাল সার্টিফিকেটের জ্বালায় প্রাণান্ত। বেশ আছে ওরা।

—ওরাই তো বেশ থাকবে।—ব্রজেন দস্তিদার বিড়িতে জোরালো একটা টান দিয়ে খক্‌খকানি আরম্ভ করে দিলে; তারপর কাশিটা একটু থামলে, নিজের আধময়লা পাঞ্জাবীর হাতাতেই

মুখটা মুছে ফেলে বললে, বেশ থাকবে বলেই তো বারোশো টাকা মাইনে পায়। এটা-সেটা করে হাজার দুই।

পেছন থেকে অনিল মৈত্র বললে, দু হাজার টাকা।

কাবলি চটির তলায় বিড়ির অবশেষটুকু নির্দয়ভাবে পিষতে লাগল ব্রজেন দস্তিদার। মুখটা বিকৃত করে, সর্দি জড়ানো নাক থেকে ঘোড়ার মতো একটা আওয়াজ ছেড়ে দিয়ে বললে, ওতো লিগ্যাল ইনকাম।—গলাটা নামিয়ে জোরালো ফিসফিসানিতে জুড়ে দিলে, আর চুরি?

—চুরি?—অনিল মৈত্র প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। পুব হাওয়ার দোলায় দোলায় তার 'হৃদয় নদীর কূলে কূলে' তখনো 'লহরী' তুলছিল। ওই শব্দটা তাকে আঘাত দিলে।

—হ্যাঁ—হ্যাঁ--চুরি।—ব্রজেন দস্তিদারের বিকৃত মুখ আরো বিকৃত হল: বলি, গাছ থেকে পড়লে যে? দুনিয়াটা কিসে চলছে তা জানো না? কোন কলেজ থেকে পাশ করে এসেছ—শুনি? সেখানে ছাত্রেরা কি নকল-টকলও করে না? ড্রপ্‌ড্‌ ডাউন লাইক্ সাম অ্যান্‌জেল?

অনিল মৈত্র ক্ষুণ্ণস্বরে বললে, উনি চুরি করেন?

—চুরি করেন বলেই তো এফিসিয়েন্ট হিসাবে এত নাম। আরো দুদিন যাক—গোটা কয়েক টেণ্ডার-রহস্য অবগত হও—ব্রজেন দস্তিদার আবার খানিকটা কেশে নিয়ে প্রায় রুদ্ধশ্বাসে বললে, তখন বুঝবে লোকটা কত বড় গুণী। এখন যা শ্রদ্ধা করছ, তখন করবে তার দ্বিগুণ।

কথা খুঁজে না পেয়ে অনিল মৈত্র বললে, ও।

ব্রজেন দস্তিদার বলে চলল, টাকা তো ওদেরই জন্যে ব্রাদার। হাতে ওদের ম্যাগনেট আছে—তার টানে আপনিই চলে আসে।

গৌতম চুপ করে শুনতে লাগল। একবার মনে এল: চুম্বক

কি রূপোকে টানে? অনিল বোকার মত বললে, তা হলে অনেক টাকা রোজগার বলুন।

—তা রোজগার কিঞ্চিৎ হয় বইকি। নইলে আর ছোটসাহেবের পরিশ্রমটুকু করেন কেন? উনি কর্মযোগী পুরুষ। এখানে কর্মের সুযোগ পান বলেই টি কে আছেন, নতুবা চটে-মটে দেশের সেবা করতে বেরুতেন। সেটা আরো মারাত্মক হত। এখন আমাদের কয়েকজনের ওপর হাত পাকাচ্ছেন. তখন কোটি নরমুণ্ডের আসনে বসে পঞ্চ 'মকারের' সাধনা করতেন।

ব্রজেন দস্তিদার 'সিনিক' হয়ে গেছে—গৌতম ভাবল। না হওয়াই আশ্চর্য। সতেরো বছর চাকরি করছে—এখন সবকিছু মিলিয়ে মাইনে পায় একশো বায়াত্তর। ঘরে জন আষ্টেক পোষ্য—আর এই বাজার।

অনিল ঘোলা চোখে চেয়ে রইল। ব্রজেনের কথাগুলো বোধ হয় গোলমেলে ঠেকছে কানে। একটু চুপ করে থেকে বললে, উনি যে বলেন, একদম চালাতে পারেন না—মাসের শেষে দেনা হয়ে যায়—

—আহা, চলবে কী করে? ওঁদের খরচ কত? তুমি দু টাকা পাউণ্ডের চা কেনো বাগবাজার থেকে, সেই চা-ই প্যাকেট বদলে বারো টাকা পাউণ্ড দরে ওঁদের ঘরে আসে নিউমার্কেট হয়ে। কলেজ স্ট্রীটের আড়াই টাকা গজের কাপড় চৌরঙ্গীর বাঘা দোকান থেকে সাড়ে আটটাকা গজে না কিনলে ওঁদের মান থাকে না। মেম সাহেবের মিষ্টি হাসিরও তো একটা আলাদা দাম আছে বাপু।

অনিল মৈত্রের ঠোঁট দুটো বৃত্তাকারে সংকুচিত হয়ে রইল, কথা বেরুল না।

ব্রজেনের দস্তিদার বলে চলল, তারপর সেই জিনিশটি।

বাদশাহী খরচ তো সেখানেই। এক বোতল হুইস্কির দাম আজকাল কত হে গৌতম?

অল্প হেসে গৌতম বললে, জানা নেই।

—কী করে জানবে? ও রসের স্বাদ তো কখনো নিলে না। মিথ্যে বলব না ব্রাদার, ওদিকে এক-আধটু শখ আমারও ছিল। যতদূর শুনেছি, হুইস্কি আজকাল চল্লিশ। স্রেফ কারফিউ এরিয়া। এখন মাসে দু-একদিন কালী মার্কা জোটে—খাঁটি দিশি মহুয়া আর পবিত্র চিটে গুড়। ওদের তো আর তা নয়। বিলিতি আঙুর ছাড়া—

—কী বকছ ব্রজেনদা।—গৌতম থামিয়ে দিলে।

—আঃ থামাচ্ছ কেন? বাইরে বৃষ্টি নেমেছে, মেজাজ খুলে যাচ্ছে—কেন বাগড়া দাও? একটু প্রাণের কথা বলতে দাও—ব্রজেন দস্তিদার ফের একটা বিড়ি বের করলে।

গৌতম বললে, আবার বিড়ি ধরাতে যাচ্ছ? এক্ষুনি তো কাশতে আরম্ভ করবে।

—শেষ কাশিটাকেই এগিয়ে আনছি। একমুখ রক্ত তুলে কখন থেমে যাব সেই কথাই ভাবছি।—এতক্ষণের তরল আবহাওয়াটাকে হঠাৎ তিক্ত আর ঘনগভীর করে তুলে ব্রজেন দস্তিদার বললে, আমার তো আর স্কচ-ফ্রেঞ্চ-ইটালিয়ানের সঙ্গে হ্যাম অ্যাণ্ড এগ জুটবে না হে। মা কালীমার্কা কারণের সঙ্গে ডাঁটা চচ্চড়ি—বেশ তাড়াতাড়িই ভবসিন্ধু পেরিয়ে যেতে পারব।

ব্রজেন দস্তিদার চুপ করল। যেন উত্তেজনার অনেকখানি বাষ্পকে এক সঙ্গে ছেড়ে দিয়ে চুপসে থেমে গেল লোকটা। কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে অনিল মৈত্র লেজারে চোখ নামালো। গৌতম আবার তাকালো জানালার দিকে—ট্রাম-বাসের কালো কালো ছায়া জলের তলা দিয়ে হাঙ্গরের মতো ভেসে চলেছে।

হাতে বিশেষ কাজ নেই—নিজের মধ্যে তলিয়ে বসেই রইল গৌতম। তার মনে হল: এই-আমরা। হাসছি, ঠাট্টা করছি, চপল হয়ে উঠছি। আমাদের ভেতরে কোথাও কোনো গভীরতা আছে, কোনো কিছু অন্তঃশীলা আছে—আমাদের সঙ্গে কোনো সমুদ্রের যোগ আছে—বাইরে থেকে তা কিছুতেই বোঝবার উপায় নেই। এক একটা মিছিল কিংবা ধর্মঘটের দিনে, কোনো বাজ-ডাকা কালো রাত্রির বিদ্যুতের আলোয় কখনো কখনো ঝড়ের মুঠো তুলে উঠে দাঁড়াই, তারপরেই আবার স্তিমিত শান্তি—আবার শিলাভার দিনযাত্রা। বুকের কান্নার সমুদ্রে আমাদের যে আগ্নেয়গিরি লুকিয়ে আছে, আমরা নিজেরাই তার কথা ভুলে থাকি।

ভুলে থাকাই ভালো। মনে পড়লেই জীবনের অর্থ বদলে যায়। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজের মুখ দেখতে পাই না—কঙ্কালের দুটো অন্ধকার চোখ আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকে। দেখি, শাদা পাঁজরার ফাঁকে ফাঁকে আগুন জ্বলছে। সে আগুন কাউকে জ্বালায় না, আমরাই জ্বলতে থাকি।

কিন্তু এ সব ভেবে কী করবে গৌতম? তার চাইতে ছুটির ভাবনাটা অনেক জরুরি। এক মাসের ছুটি। অনেকদূর এগিয়ে এসেছে—সব ব্যবস্থা পাকা—এখন ঘাটে এসে ভরাডুবি না হয়।

বেয়ারা অযোধ্যা এসে ব্রজেনের টেবিলের সামনে দাঁড়ালো।

—হেড ক্লার্ক ডাকছেন।

—যাচ্ছি—যা।

অযোধ্যা চলে যাচ্ছিল, গৌতম ডাকল।

—ছোট সাহেব কবে ফিরবেন জানিস?

—ফিরছেন তো।

—ফিরেছেন? গৌতমের হৃৎপিণ্ড লাফিয়ে উঠল।

—আজ সকালে এসেছেন। একটু আগেই ফোন করেছিলেন। একটার পর অফিসে আসবেন।

অযোধ্যা চলে গেল।

উঠতে উঠতে ব্রজেন দস্তিদার বললে, তোমার ভাবনা মিটল হে। আজই অর্ডার হয়ে যাবে।

—না হলে যে বিপদে পড়ব ব্রজেনদা।

—তুমি বিপদে পড়লে সংসারে তুমি ছাড়া আর কারো অসুবিধা হবে না অবশ্য—যেতে যেতে ব্রজেন দস্তিদার বললে, তবে ছুটি তোমার হয়ে যাবে।

সেই আশাতেই তো আছে গৌতম। ঝাঝায় চিঠি লিখে দেওয়া হয়েছে, টুকিটাকি জিনিশপত্রও কেনা হয়েছে অল্পসল্প। আটকে আছে কেবল তুটো ব্যাপারের জন্যে। ছুটি আর টাকা।

টাকা পাওয়া যাবে—আজই। এখন ছুটিটা হলেই আর ভাবনা থাকে না।

বাইরে মেঘের ডাক শোনা গেল বারকয়েক। বৃষ্টি থেমে আসছে।

একমাসের চেঞ্জ। শখের ব্যাপার নয়। শখের কথা ভাবাই যায় না। ডাক্তারই অবস্থাটা প্রায় অসহ্য করে তুলেছে। পথে ঘাটে, দোকানে বাজারে, যেখানেই দেখে তাড়া লাগায়।

ঃ কী মশাই. স্ত্রীর কী ব্যবস্থা করলেন ?

গৌতম বিব্রতভাবে হাত কচলায় ঃ আজ্ঞে চেষ্টায় তো আছি।

ঃ কিন্তু চেষ্টা করতে করতে ওঁকে মেরে ফেলবেন যে! শেষ-কালে টি-বি ডেভেলপ করবে।

গৌতম কুঁকড়ে যায় আরো।

ঃ জানেন তো আমাদের অবস্থা। অফিসের সামান্য মাইনে, হাতে কিছু থাকে না—সংসার—

ডাক্তার অধৈর্য হয়ে ওঠে। এসব কথা সে অনেক শুনেছে—প্রতিদিনই শুনতে হয় তাকে। মানুষের দুঃখের পাঁচালিতে বিব্রত হতে গেলে তার আর ডাক্তারী করা চলত না। সদ্যোমৃতকে ঘিরে যখন কান্নার রোল উঠেছে বাড়িতে, তখন হাত বাড়াতে পারত না ভিজিটের টাকার জন্যে।

তাই শুনেও শুনতে চায় না। গৌতমকে মাঝখানে থামিয়ে দিয়েই সংক্ষেপে সমাধান করে দেয় : রেখে দিন আপনার অফিস আর সংসার। ও-সব আগে, না আপনার স্ত্রীর প্রাণটা আগে? সব ফেলে বেরিয়ে পড়ুন। না হয় দেশেই চলে যান না? অন্তত খোলা আলো-হাওয়াও তো পাবেন ভদ্রমহিলা।

: দেশ তো ময়মনসিং। কী করে—

ডাক্তার নিজেই এবার বিব্রত হয়। জ্ঞানপাপীর মতো অস্বস্তি বোধ করে পালিয়ে যেতে চায় সামনে থেকে। চলে যেতে যেতে জানিয়ে যায় : তবু যা হয় একটা করুন। ইউ হ্যাভ নো রাইট টু কিল্ ইয়োর ওয়াইফ।

গৌতম দাঁড়িয়ে থাকে ম্লান হয়ে। তাকে আর নতুন করে কী বোঝাতে চায় ডাক্তার। দিনের পর দিন তাকেই তো সব দেখতে হয় চোখ মেলে, তারই বুকের ভেতরটা সারাক্ষণ কুরে কুরে খায় অক্ষমতার যন্ত্রণা। সুমতির রক্তহীন পাণ্ডু মুখটা যেন প্রতি মুহূর্তে তাকে চাবুক মারে, শীর্ণ হাতটা মুঠোর মধ্যে টেনে নিয়ে তার শীতলতায় সে শিউরে ওঠে, বিনিদ্র রাতে অসীম আতঙ্কে শুনতে পায় কাঁপা পাঁজরের মধ্যে থেকে শাঁ শাঁ করে অস্বাভাবিক নিঃশ্বাসের আওয়াজ উঠছে স্ত্রীর।

বিয়ের বছর চারেক পরে একটি মৃত শিশুকে পৃথিবীতে এনেছিল সুমতি। সেই থেকে শরীর ভেঙেছে—আর সমানে ভেঙেই চলেছে মনও। সে মনের চেহারাটা চোখে দেখা যায় না বলেই

গৌতমের আতঙ্কটা আরো ব্যাপক, দুঃস্বপ্নের পরিমাণটা আরো বেশি।

হয়তো রাত দুটোর সময় চমকে জেগে উঠেছে কোনোদিন। ঘুমের মধ্যেই টের পেয়েছে, পাশে নিঃশ্বাসের সেই কাঁপা শব্দটা আর শোনা যাচ্ছে না। বিছানায় উঠে বসেই দেখতে পেয়েছে দরজাটা খোলা। বেরিয়ে এসে দেখেছে, অন্ধকার বারান্দায় দেওয়ালে পিঠ দিয়ে চুপ করে বসে আছে সুমতি।

ঃ একি—উঠে এসেছ কেন এত রাতে ?

সুমতির জবাব নেই।

ঃ এসো, ঘরে এসো—গায়ে হাত দিয়েই টের পেয়েছে সুমতি কাঁদছে।

ঃ পারছি না, আমি আর পারছি না!—সুমতির নীরব কান্না উচ্ছ্বসিত হয়ে ফেটে পড়েছে এবার ঃ আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে। অন্তত একবারটি নিয়ে চলো কৃষ্ণনগরে—মা-কে দেখে আসব।

ঃ আচ্ছা যাব, কালই যাব। এখন উঠে এসো দেখি—

পরের দিন কথাটা তুলতেই সুমতি বলেছে ঃ এখন থাক।

ঃ তুমি যে বলেছিলে, কৃষ্ণনগরে যাবে—

ঃ না-না, সে এখন নয়। মাস দুই আগেই তো ঘুরে এলুম। এখন যেতে চাইলে মা রাগ করবেন।

এবার মা অর্থে গৌতমের মা। শাশুড়ি।

গৌতমের মনটা আবার সংকুচিত হয়ে উঠল। মা-র কথা ভাবলে তার অস্বস্তি লাগে। আশ্চর্য, কি রকম যেন হয়ে গেছেন। বাবা মারা যাওয়ার পর থেকে এ ভাবটা তাঁর আরো বেড়েছে। ঠিক সিনিক হয়ে যাচ্ছেন ব্রজেনদার মতো।

—ছেলেপুলে হলে শরীর একটু ভাঙেই। আবার সেরেও যায়। অত বাড়াবাড়ি করবার তো কিছু দেখিনা।

ঃ কিন্তু ডাক্তার বলছিল, চেঞ্জে না নিয়ে গেলে—

ঃ ডাক্তারেরা ওই রকমই বলে—মা'র স্বর আশ্চর্য রকম কঠিন ঃ

ঃ যাওয়ার খরচা তো আর তারা পকেট থেকে দেয়না। এই তো তোমার আয়—এখন যদি বউকে নিয়ে বাইরে গিয়ে একরাশ টাকা খরচ করে এসো—তারপরে কী হবে ভেবে দেখেছ? দু'দিন পরেই লোটনের বি-এ পরীক্ষার ফী দিতে হবে—সেখানে আবার মোটা টাকার ধাক্কা—

ঃ সে একরকম হবেই মা।—গৌতমের গলা অপরাধীর মতো ঃ কিন্তু সত্যিই ওর শরীরটা—

ঃ বেশ তো বাবা, দরকার বোধ হলে নিয়ে যাবে বৈকি বাইরে। —মা একেবারে নিরাসক্ত আর নিরীহ ঃ শরীর খারাপ হলে চেঞ্জে যাবার দরকার বৈকি। তবে কি জানো—মুহূর্তের জন্যে মা থেমে যান ঃ আমিও তো ছেলেপুলে পেটে ধরেছি বাবা। এতদিন বেঁচেও আছি তারপরে। চেঞ্জে তো যেতে হয়নি।

এরপরে আর বলার কিছু নেই।

……সামনে খোলা ফাইলটার দিকে তাকালো গৌতম। লেখাগুলোকে একরাশ অবোধ্য কিউনিফর্মের মতো মনে হচ্ছে—চোখে আঘাত দিচ্ছে এসে। ওই শরীর নিয়েই এখন হয়তো কলতলায় বাসন মাজতে বসেছে সুমতি, কিংবা নইলে একরাশ কাচা কাপড়-জামা নিয়ে ছাদে উঠছে, সিঁড়ির রেলিং ধরে জিরিয়ে নিচ্ছে থেকে থেকে—এতদূর থেকেও তার কাঁপা বুকের আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে গৌতম।

না—বুকের আওয়াজ নয়, পাখার শব্দ, একটা টাইপ রাইটার চলতে শুরু করেছে ঘটঘটিয়ে। টুকরো টুকরো কথার আওয়াজ।

বেয়ারাদের আসা-যাওয়া। কোথায় যেন কলিং বেল বাজল। কাঠের পার্টিশনের ওপারে অ্যাকাউন্টস্ সেক্শনে তর্ক আরম্ভ হয়েছে। ইস্ট্ বেঙ্গল ভার্সাস মোহনবাগান।

ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা কামড়ে ধরে গৌতম ভাবতে লাগল। যাওয়ার ব্যাপারটা ঠিক হওয়ার পর থেকেই মা-র মুখ থমথম করছে। ক'দিন ধরে কথাও বলছেন না ভালো করে। আর গৌতমকে শুনিয়ে শুনিয়েই সুমতিকে বলছেন: থাক বৌমা, থাক। তোমায় আর ভোরে উঠে উনুন ধরাতে হবে না। রোগা শরীর, হয়তো মাথা ঘুরেই পড়ে যাবে। তুমি বরং আর একটু শুয়ে থাকো গে, সকালের পাটটা আমিই সেরে নেব এখন।

কথাটা বলছেন সস্নেহে, কিন্তু তার বিষটুকু বুঝতে কষ্ট হয় না।

সুমতি বলেছে: কেন তুমি এ সব ঝামেলা বাড়াচ্ছ? আমার চেঞ্জের দরকার নেই।

গৌতমের ধৈর্যচ্যুতি হয়েছে।

: দরকার আছে কিনা সে আমি বুঝব। তুমি চুপ করো।

: সংসারে অশান্তি বাড়িয়ে কী লাভ?

: শান্তি কবে ছিল যে আজ অশান্তির জন্যে দুশ্চিন্তা করব? মা-র নয় মাথার ঠিক নেই, কিন্তু আমি তো তা বলে পাগল হয়ে যাইনি। তোমাকে এ ভাবে আমি মেরে ফেলতে পারব না।

: মরব কেন? আমি তো বেশ আছি।

: হুঁ, চমৎকার আছো।—সুমতির ফ্যাকাশে মুখের দিকে দিকে খানিক্ষণ জলন্ত চোখে তাকিয়ে থেকেছে গৌতম: কত ভালো আছো সে তো দেখতেই পাচ্ছি চোখে।

নাঃ, আর নয়। এবার স্বার্থপর হতেই হবে তাকে। মা রাগ করুন, যা হওয়ার হোক। টাকাটা আজই পাওয়া যাবে নিশ্চয়।

কথাবার্তা সবই তো হয়ে আছে—শুধু একটা সই করে চেকটা নিয়ে আসা। এখন যদি ছুটিটা পাওয়া যায়—

পিছনে আবার গুনগুন করতে শুরু করেছে অনিল মৈত্র : 'শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ওই খোলা—'

মাত্র সেদিন অফিসে ঢুকেছে। এখনও গান আছে গলায়। কাটুক বছর খানেক। তারপর!

ব্রজেন দস্তিদার ফিরে এল।

—নিজেরা ভুল করবে, দোষ চাপাবে আমাদের ঘাড়ে। দিব্যি আছে সব!—শব্দ করে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললে, ওহে গৌতম, তোমার ছোট সাহেব এসেছে।

—এসেছে ?

—হুঁ। দেড় হাত লম্বা একটা পাইপ মুখে দিয়ে অফিসে এসে ঢুকলেন মহাপ্রভু! সামনে পড়ে গেল, অগত্যা একটা নমস্কার করলুম। এমন দন্তবিকাশ করল যে দেখে গা জ্বলে গেল। যত সব—

একটা অভব্য গাল উচ্চারণ করল ব্রজেন দস্তিদার। সিনিক হয়ে গেছে—নিজের চারদিকে একটা ঘৃণার বৃত্ত রচনা করে রেখেছে। সোজা চোখে কিছুই আর দেখতে পায় না। কিন্তু গৌতমের এখনো আশা আছে। অনিল মৈত্রের মতো না হোক—এখনো জীবনের ওপর তার বিশ্বাস আছে খানিকটা। তাই ছোট সাহেবের সমস্ত ত্রুটি সত্ত্বেও তাকে অবিমিশ্র খারাপ বলে ভাবতে ভালো লাগে না গৌতমের। ছুটিটা তাহলে বোধ হয় পাওয়াই যাবে।

কিন্তু মা ?

আর ভাববে না। ভাবতে গেলে তার আর শেষ নেই কোথাও। আমার স্বার্থের প্রয়োজনেই সংসার। সংসারের হাড়িকাঠে কেন

বলি দেব আমার স্বার্থকে ? গৌতম ভাবল, এবার আমাকে স্বার্থপর হতেই হবে। যে যা-ই বলুক।

অনিল মৈত্র গুনগুন করছে : "নীলদিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল"—

নীল দিগন্ত। ঝাঝা। নীল পাহাড়। নীল আকাশ, লাল ফুল। গেরি মাটির পথ। পাতা ঝুরু-ঝুরু শালবন। মহুয়ার ডালে ডালে হরিয়াল। এক মাসেই সেরে উঠবে সুমতি। ফ্যাকাশে শাদা মুখ গোলাপী হয়ে উঠবে স্বাস্থ্যের ছোঁয়ায়। মা-র রাগ কদিন থাকবে আর ? এখন শুধু ছোট সাহেবের একটুখানি দাক্ষিণ্য পেলেই হয়।

লোকটা কি খারাপ ? ব্রজেন দস্তিদার তাই বলে। কিন্তু মানুষকে অত ছোট ভাবতে ভালো লাগেনা গৌতমের। সকলকে অশ্রদ্ধা করে কি বাঁচা যায় কখনো ?

॥ ২ ॥

সেই দুরু-দুরু মুহূর্ত। প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে অপেক্ষা। ছোট সাহেব মিস্টার ভৌমিক প্রকাণ্ড পাইপটা ধরালেন। মুখের ওপর দামি ভার্জিনিয়ার নীল ধোঁয়া পাকিয়ে উঠল একরাশ।

বেঁটে খাটো মানুষটার বেমানান একটা লম্বা পাইপ। পাইপের মুখটা আধখানা হুঁকোর খোলের মতো। এমন অদ্ভুত লাগে দেখতে! ইচ্ছে করেই যেন নিজেকে ক্যারিকেচার করছেন ছোটসাহেব।

ঠোঁট থেকে পাইপ সরিয়ে, শ্রীকৃষ্ণের বাঁশির ভঙ্গিতে ধরে, মিস্টার ভৌমিক বাঁশির সুরের মতোই বললেন, এই যে গৌতমবাবু।

বেঁটে রোগাটে চেহারা, পাউডার-ক্রীমে অতিরিক্ত মসৃণ গাল, গলার আওয়াজ অস্বাভাবিক মিহি। অনেক চকোলেট আর আইসক্রীম খেয়ে আওয়াজটিকে অমন মোলায়েম করে তুলেছেন বলে মনে হয়। এই ধরণের লোককেই কি 'লেডীজ ম্যান' বলে?

—স্যার, আমার ছুটির দরখাস্তটা—

—আই সী!—শিস দেওয়ার ভঙ্গিতে ভৌমিক বললেন, বসুন।

গৌতম তাকিয়ে রইল। শেষ কথাটা ঠিক বুঝতে পারছে না।

—বসুন না—কোমল ললিত হাসিতে ভৌমিক একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলেন।

—সে কি স্যার! আপনার সামনে—

—দ্যাট্‌স্ অল রাইট। বসুন—

—স্যার—

—ও, ডোণ্ট বি সো অফিসিয়্যাল। আমি বসতে বলছি আপনাকে। টেক্ ইয়োর সীট।

ছোট সাহেবের দাক্ষিণ্যে অভিভূত হয়ে পড়ল গৌতম। সত্যিই অবিচার করে ব্রজেন দস্তিদার! ছোট সাহেব ভারী অমায়িক লোক। এতটুকু অহঙ্কার নেই, তার মতো দীন কেরানীকে পর্যন্ত চেয়ার 'অফার' করেন। আর এর আগে যিনি ছিলেন? চ্যাটার্জি সাহেব? বাঘের মতো প্রকাণ্ড মুখে গাঁক গাঁক করে কথা কইতেন, চেয়ারে বসা তো দূরে থাক, ঘরে ঢুকতেই হৃৎকম্প হত।

—ছুটি চাইছেন কেন? স্ত্রীর অসুখ?

গৌতম মাথা নাড়ল।

—কী অসুখ?

—অ্যানিমিয়া স্যার। অন্য কমপ্লিকেসিও আছে।

—অ্যানিমিয়া? পাইপ থেকে আবার দামি ভার্জিনিয়ার নীল ধোঁয়া ছড়িয়ে ভৌমিক বললেন, আঙুর খেতে দিন, এসেন্স অব্ চিকেন খাওয়ান—

—আমাদের অবস্থা তো জানেন স্যার।—ক্ষীণস্বরে গৌতম বললে, যা মাইনে পাই—

'লেডীজ্ ম্যানের' ভ্রূকুঞ্চিত হল।

—ছাটস্ দি ট্রাবল!—বাঁশির সুর এক পর্দা চড়া হয়ে উঠল: ওইটেই আমাদের জাতের দোষ। সব সময় পাউণ্ড. শিলিং. পেন্সের হিসেব। এই ভাবেই আমরা ঘরের মেয়েদের হত্যা করি গৌতম বাবু। উই আর ক্রিমিন্যালস!

গৌতম অস্বস্তি বোধ করল। নতুন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে এই কথাই বলেছিল ডাক্তার: উই আর কিলিং আওয়ার ওয়াইভস্ অ্যাণ্ড চিলড্রেন। আরো রূঢ় কথা এর পরে বলে যেতে পারতেন ভৌমিক, বাঙালি পুরুষদের স্বার্থপর হৃদয়হীনতা সম্বন্ধে দীর্ঘচ্ছন্দ

বক্তৃতা দিতে পারতেন একটা। কিন্তু 'টিপটপ' ঝকঝকে ভৌমিক সাহেব এই পর্যন্ত এসেই থামলেন, ধিক্কারের জেরটা বেশিদূরে অবধি টানলেন না আর।

—চেঞ্জে যাচ্ছেন? সে ভালোই হবে। কোথায় যাচ্ছেন? মুস্থরি?

—না স্যার।

—কেন এইটেই তো ওখানে বেস্ট সীজন। ড্যান্সিং প্রোগ্রাম ইন্ হ্যাকম্যান। সুপার্ব ভিউ অব্ কেদার-বদরী। ইউ মে ট্রাই আলমোড়া অল্‌সো। নাইনিও যেতে পারেন, আ—ছাট্ ডিভাইন লেক!

—স্যার, অতদূরে—

—সেই পাউণ্ড. শিলিং. পেন্‌স?—ভৌমিক সাহেব আবার ভ্রূকুঞ্চিত করলেন এবং দ্বিগুণ সংকুচিত হল গৌতম।

—তবে কোথায় যাচ্ছেন?

—ঝাঝা। গৌতমের স্বর ক্ষীণতর।

—ঝাঝা? ভৌমিক নিরাশ হয়ে বললেন, এনিওয়ে, হবে একরকম। হঠাৎ তাঁর মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল: কাছাকাছি যদি যেতে যান—তা হলে গিরিডি যান না। আমাদের একটা বাড়ী আছে ওখানে। আট দশটা ঘর, আউট হাউস, ফুল-ফলের বাগান, গ্যারাজ—কো-নো অসুবিধে হবে না। চার পাঁচটা মালী আছে, সার্ভেন্ট আছে—জাস্ট পে দেম্ সাম্‌থিং—সব করে দেবে। আমরা অনেকদিন যাইনে—আপনারা গেলে দে উইল্ বি টু হ্যাপি।

গৌতমের রক্ত শুকিয়ে এল। চার পাঁচটা মালী—হয়তো চাকরও জন চারেক হবে। পে দেম্ সাম্‌থিং। তাদের 'পে' করতে গেলে আর দেখতে হবে না—তিন দিনেই গৌতমকে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে আসতে হবে কলকাতায়।

ঠোঁট চেটে গৌতম বললে, সে তো খুব ভালোই স্যার। আপনার বাড়িতে গিয়ে থাকব তার চাইতে লাক আর কী আছে। তবে ঝাঝায় সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি·কিনা একরকম—

—ও, কে—ও, কে! তা হলে পরেই যাবেন-কোনো সময়।

গৌতম উঠে দাঁড়ালো।

—ছুটির সময় অর্ডারটা স্যার তাহলে আজই—

—দাঁড়ান, দাঁড়ান!—ভৌমিক সাহেব বললেন, এখনো ওটা ঠিক ডিসাইড করতে পারিনি।

চোখের সামনে এতক্ষণ চমৎকার একটা মরীচিকা ফুটে উঠেছিল, এক মুহূর্তে মিলিয়ে গেল। গৌতমের উল্লসিত হৃৎপিণ্ডটা ফাটা ফুটবলের মতো চুপসে গেল তৎক্ষণাৎ।

—সে কি স্যার! —আর্তকণ্ঠে গৌতম বললে, এত আশা করে আছি—

—আপনাকে আমি ডিস্‌অ্যাপয়েণ্ট করতে চাইনে, বাট দেয়ার আর ম্যাটারস্! এক মাসের জন্যে আপনাকে 'রিলিফ' করতে হবে—অফিসের দিকটাও তো দেখতে হয়! অ্যারেঞ্জমেণ্ট না করে কি ভাবে কথা দিই বলুন!

পুনর্মূষিকো ভবঃ!

পা থেকে মাথা পর্যন্ত সোজা জ্বলে উঠল গৌতমের। এ-ই যদি মনে ছিল, তা হলে এতক্ষণ ধরে কী দরকার ছিল এসবের? এসেন্স অব চিকেন, নাইনি, আলমোড়া, গিরিডির বাংলো? এ কিরকম রসিকতা? ব্রজেন দস্তিদারই ঠিক বলেছিল, সে-ই এদের বেশ ভালো করে চিনেছে।

শিল্পীর নিপুণতায় প্রচণ্ড ক্রোধটাকে বিগলিত বিনয়ে পরিণত করে ফেলল গৌতম।

—একটু যদি দয়া করেন স্যার—

—আমি চেষ্টা করব গৌতমবাবু। মাই বেস্ট। সী মি টু-মরো।

বলেই একটা ফাইলের ফিতে খুলতে লাগলেন। অতএব আর অপেক্ষা অর্থহীন।

—নমস্কার স্যার—

জ্বলতে জ্বলতে গৌতম বেরিয়ে এল। ভৌমিকের রসিকতার উত্তরে একটা শারীরিক প্রত্যুত্তর দেবার প্রবল বাসনা জেগেছিল মনে। কিন্তু তা হলে চাকরি থাকত না।

টু-মরো! আবার একটা অসহ্য দিন। অসহ্যতর প্রতীক্ষা। ফিরে এল নিজের জায়গায়, দু হাতে কপাল টিপে ধরে বসে পড়ল।

—কী হল ব্রাদার? অমন মুষড়ে পড়লে যে? ছুটি দিলেনা? —ব্রজেন দস্তিদারের জিজ্ঞাসা।

—বলেছে, সী মি টু-মরো।—বিশ্রী মুখ করে গৌতম উত্তর দিলে, শান্তিজল ছিটিয়ে দিলে একেবারে।

ব্রজেন দস্তিদার হাসলঃ পাবে হে পাবে। একটু ল্যাজে খেলাচ্ছে আর কি।

—এভাবে ল্যাজে খেলিয়ে কী লাভ?—ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলে অনিল মৈত্র।

—লাভ?—বিড়ি বের করে ঠোঁটে লাগিয়ে ব্রজেন বললে, ছুটি চাইলেই যে সঙ্গে সঙ্গে সেটা পাকা ফলের মতো হাতের মুঠোয় এসে পড়ে না—সেইটুকু জানিয়ে দেওয়াই লাভ। তাতে অফিসের ডিসিপ্লিন থাকে।

—এর সঙ্গে ডিসিপ্লিনের সম্পর্ক কী?—আবার ভীত জিজ্ঞাসা অনিল মৈত্রের।

—বুঝবে ভায়া, বুঝবে।—একটা পুরোনো সস্তা লাইটার দিয়ে অনেক চেষ্টায় বিড়িটা ধরিয়ে ব্রজেন বললে, জ্ঞান বৃক্ষের সব ক'টি

বলাই চাখতে হবে আস্তে আস্তে। তবে যতদিন কিছু না বুঝছ, ততদিনই সুখে আছ। ইগ্‌নোরেন্স ইজ ব্লিস্‌!

গৌতম বিরক্ত হয়ে বললে, এখন কী করি ব্রজেনদা? মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে একেবারে।

—বলছি তো, হয়ে যাবে। ওঁরা লীলা করছেন, ওতে মন খারাপ কোরোনা। বিড়ি নেবে একটা?

—আমি কি বিড়ি খাই?

বিরক্ত হয়ে জানালার বাইরে দৃষ্টি ফেলল গৌতম। বৃষ্টি থেমে যাওয়া আকাশে রামধনু উঠেছে। ভারী আশ্চর্য লাগল হঠাৎ। কলকাতার মাথার ওপর কখনো রামধনু উঠতে পারে কোনোদিন মনেই হয়নি।

গৌতম খাতায় চোখ নামালো। একরাশ দুর্বোধ্য কিউনিফর্মের মতো লেখাগুলো তার চোখের সামনে পোকার শুঁড়ের মতো নড়ছে—তাকিয়ে থাকা যায় না। এখনো ছুটির একঘণ্টা দেরী। পুরো ষাট মিনিট।

ঃ সী মি টুমরো।

ঃ আপনাকে আমি ডিস্‌-অ্যাপয়ণ্ট্‌ করতে চাইনে।

ঃ হয়ে যাবে ব্রাদার—হয়ে যাবে। ল্যাজে খেলাচ্ছে।

মাথার ভেতব কথাগুলো ঘুরপাক খাচ্ছে। ট্রামের চাপাচাপি ভীড়ের মধ্যে ঘর্মাক্ত দেহে দাঁড়িয়েছিল গৌতম। হয়ে যাবে। কিন্তু যদি না হয়, যদি শেষ মুহূর্তে—

কনুইয়ের ধাক্কায় দুধারের যাত্রীদের বিধ্বস্ত করে একটি বিপুলাকার ব্যক্তি নেমে গেলেন। পাশের লোকটির সঙ্গে একটা উৎকট সংঘর্ষ কোন মতে সামলে নিলে গৌতম।

—একটু ভদ্রভাবে নামতে পারেন না? —একজন খেঁকিয়ে উঠলেন।

—নিজে ভদ্রতা শিখুন, আমাকে শেখাতে হবে না— বিপুল ব্যক্তিটি মাটিতে অবতরণ করলেন। কম্বিনেশন গুরু ভারী পদক্ষেপে ফুটপাথ কেঁপে উঠল।

—ছোটলোক।

ট্রাম ছেড়ে দিয়েছে তখন। অবতীর্ণ ভদ্রলোকটি গলা চড়িয়ে বললেন, তুই ছোটলোক।

—হোয়াট্! ভদ্রতার উপদেষ্টা লাফিয়ে পড়বার উপক্রম করলেন, জনৈক নিরীহ টেনে ধরলেন তাঁকে।

—আঃ কী করছ গুহ? মারামারি করবে নাকি?

—করাই উচিত।—রোগা টিংটিঙে গুহ আস্ফালন করে বললে, ব্যাটা পালালো। নইলে শিখিয়ে দিতুম ভদ্রতা কাকে বলে।

শেখাতে গেলে গুহর অদৃষ্টেই দুঃখ ছিল, গৌতম ভাবল।

—মানুষ আজকাল এত অভদ্র আর স্বার্থপর হয়ে গেছে! ছিঃ—!—আর একজন সখেদে বললেন। গৌতম তাকিয়ে দেখল। বক্তা নিজেই হাঁটু দুটোকে এমন ভাবে ছড়িয়ে আছেন যে পাশের লোকটিকে কায়ক্লেশে সীটের ওপর নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছে।

তারপর ভদ্রতার সংজ্ঞা নিয়ে উত্তেজিত বিতর্ক আরম্ভ হল।

গৌতম আবার ফিরে এল নিজের চিন্তার মধ্যে। যদি শেষ পর্যন্ত সত্যিই ছুটি না পাওয়া যায়?

হিংস্রভাবে সে ঠোঁটে দাঁত চাপল।

—রিজাইন দেব, করবনা চাকরী। সুমতিকে বাঁচানো আগে, না চাকরি আগে?

চাকরি আগে। কানে সুবুদ্ধির উপদেশ শোনা গেল। এক

কণা আগুন জ্বলে ওঠবার আগেই একরাশ বরফ-জল ছড়িয়ে পড়ল তার ওপরে। পকেট থেকে রুমাল বের করে গৌতম মুখ আর কপালের ঘাম মুছে ফেলল। নিজের অজ্ঞাতেই কখন মেরুদণ্ড বেঁকে নুয়ে পড়েছে, হাঁটুতে এমন জোর আর নেই যে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে একবারের জন্যেও।

—নাঃ, ছুটি দেবেই।—নিজেকে আশ্বাস দিয়ে গৌতম মনে মনে বললে, ভৌমিক লোক এত খারাপ নয়। ব্রজেন দস্তিদার সিনিক্ হয়ে গেছে—দু'বেলা ভৌমিককে গালাগাল দেয়, তবু সে-ও বলেছে ছুটি দেবেই।

ছুটি দেবেই। মনকে জোরালোভাবে সান্ত্বনা দিয়ে গৌতম সামনের দিকে তাকালো। ট্রামের দরজায় গাদাগাদি ভিড়, শূন্যে ঝুলতে ঝুলতে চলেছে কয়েকজন। তবু তার ভেতর দিয়েও দেখা যাচ্ছে ফালি-ফালি সবুজ ঘাস বৃষ্টিতে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, চিকচিক করছে গাছের পাতা, বিকেলের স্বচ্ছ নীল আকাশ স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে আছে।

'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল'—

ঝাঝা। ছোট একটি বাংলো। রাঙা মাটির পথ। কলকাতার এই ঘাম-ঝরানো দমচাপা দিনগুলো স্বপ্নের চাইতেও সুদূর।

ভৌমিক ছুটি দেবেই।

শুধু টাকাটার অপেক্ষা। সেটা আজই পাওয়া যাবে। সেই আশাতেই চলেছে গৌতম।

কী করে টাকাটা জুটে গেল—আশ্চর্য। প্রায় আরব্য উপন্যাসের গল্পের মতো যেন আকাশ ফুঁড়ে পড়ল। বছর চারেক আগেকার কথা। তখনো বিয়ে করেনি গৌতম—জীবন এমনভাবে হিসেবের খাতা হয়ে ওঠেনি। সে-সময় ছোটখাটো কাগজে অল্প-বিস্তর সাহিত্যচর্চা করত কখনো কখনো। কোনো কুলীন কাগজে

অবশ্য সে ঠাঁই পায়নি—ছুটো চারটে অখ্যাত অর্ধখ্যাত পত্রিকায় টুকরো-টাকরা গল্প লিখত মাঝে মাঝে। টাকা-পয়সা কখনো বিশেষ কিছু পেত না, ছাপার অক্ষরে নিজের নামটা দেখেই ধন্য হয়ে যেত।

তারপর স্ত্রী ঘরে এল, সহস্র পাকে জড়ালো সংসার, মিটে গেল সাহিত্যের পালা। অবশ্য সেজন্য গৌতম যে খুব মনোবেদনা বোধ করেছে, তা-ও নয়। যেমন অবলীলাক্রমে একদিন সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিল, তেমনি ভাবেই তাকেও ছেড়ে গেল সাহিত্য। কোনো নেশাই কখনো তাকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরতে পারেনি, সাহিত্যও পারল না। তা ছাড়া নিজের লেখার ওপরে বিশেষ কোনো মোহও ছিল না গৌতমের। লাইব্রেরি থেকে নতুন নতুন বই পড়েই এখন খুশি হয় সে, ভালো বিলিতী বই পেলে আরো ভালো লাগে।

অথচ সেই পরমাশ্চর্য ব্যাপারটা ঘটল চার বছর পরে। গেঞ্জী গায়ে, পরনে লুঙ্গি, পায়ে রবারের চটি—নীল ফুলের ছাপ আঁকা একটা থলে হাতে নিয়ে সে বাজারে যাচ্ছিল। হঠাৎ সামনে ছুটি মূর্তির আবির্ভাব ঘটল।

একজনের পরণে বুশশার্ট আর ট্রাউজার, অপর জনের মিহি ধুতি আর সিল্কের পাঞ্জাবী। একজনের হাতে চুরুট, আর একজনের হাতে গোল্‌ডফ্লেক সিগারেটের টিন।

নম্বর খুঁজতে খুঁজতে ছজনে আসছিলেন মনে হল। গৌতমকে দেখে বুশশার্ট বললেন, ছত্রিশ নম্বর কত দূরে বলুন তো?

ছত্রিশ নম্বর! সে তো গৌতমেরই ঠিকানা। কৌতূহলী হয়ে বললে, ছত্রিশ নম্বরে কা'কে চাই?

—গৌতম সান্যালকে।

—আমিই গৌতম সান্যাল। ছত্রিশ নম্বরে থাকি।

—আপনি ?

দুজোড়া চোখ একসঙ্গে গৌতমের সর্বাঙ্গ লেহন করে গেল। রং-ওঠা পুরোনো লুঙ্গি, ময়লা বগলছেঁড়া গেঞ্জী, কাদামাখা রবারের চটি, নীল ফুল আঁকা চটের থলেটার ফেঁসোয় আধখানা শুকনো লঙ্কা ঝুলছে। দুজনের যে চকিত একটা দৃষ্টিবিনিময় হল সেটা চোখ এড়ালো না গৌতমের।

—ন্-নমস্কার—সিল্‌কের পাঞ্জাবী অভিবাদন জানালো। বুশশার্ট কথা বললে না, গম্ভীর মুখে হাত তুলল কেবল।

—নমস্কার। কী দরকার বলুন তো ?

—আপনার সঙ্গে একটু বিজ্‌নেস্ টক্ ছিল।—সিল্‌কের পাঞ্জাবী বললে ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে।

—বিজ্‌নেস্ টক্ ? গৌতম ভ্রূকুঞ্চিত করল ঃ আমার সঙ্গে ?

—আপনার সঙ্গেই। তা আপনি তো বাজারে যাচ্ছেন দেখছি। চলুন, হাঁটতে হাঁটতেই কথা বলি।

দুর্বোধ্য একটা দুর্ভাবনায় মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠল গৌতম। তার সঙ্গে এভাবে বিজ্‌নেস-টকের দরকার থাকতে পারে একমাত্র ইন্‌শিয়োরেন্স্ এজেন্টের। কিন্তু এদের ঠিক তা মনে হচ্ছে না—যেন একটু বিশিষ্ট, একটু সম্ভ্রান্ত। বললে, জরুরি কথা থাকে তো আমার বাসাতেই চলুন। একটু পরেই নয় বাজারে বেরুব।

—না, না, অত ব্যস্ত হবেন না।— অভয় দিয়ে সিল্‌কের পাঞ্জাবী বললে, যেতে যেতেও কথাটা হতে পারবে। আমরা 'স্টারলিট্ পিকচার্স' থেকে আসছি। আমাদের কোম্পানির নাম শুনেছেন আশা করি। "ব্যথার কাকলি" ছবিটা আমরাই করেছিলুম। আমি কোম্পানির প্রোডাক্‌শন ম্যানেজার বরেন সাঁতরা। আর ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ডিরেক্‌টার বিশু জোয়ার্দার —এঁর নামটাও নিশ্চয় জানেন।

নাম না জেনেও তটস্থ হয়ে গৌতম বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়। জানি বই কি। তা আপনারা আমার কাছে কেন?

—আপনার একটা গল্প আমরা কিনতে চাই।

—আমার গল্প!—চলতে চলতে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌতম, হৃৎপিণ্ডটা একবার আকাশে লাফিয়ে উঠে পরক্ষণেই মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ল। সাহিত্যের আকাশে এত চন্দ্র-সূর্য গ্রহ-নক্ষত্র থাকতে শেষকালে গল্পের জন্যে তার কাছে! লেখক হিসেবে সে যে এমন একটি বিখ্যাত বস্তু এ খবর তো এর আগে তার জানা ছিল না। তার ওপরে চার-পাঁচ বছর ওসব সে ছেড়েও দিয়েছে।

বারকয়েক খাবি খেয়ে বললে, দেখুন, কোথাও বোধ হয় একটা ভুল করছেন। আমি তো আজকাল আর গল্প-টল্প লিখি না। তাছাড়া সিনেমার গল্প আমার আসেও না।

সিল্কের পাঞ্জাবী—অর্থাৎ বরেন সাঁতরা কেমন ঘাবড়ে গিয়ে বুশশার্ট পরা বিশু জোয়ার্দারের দিকে তাকালেন। বিশু জোয়ার্দার গম্ভীর মুখে ট্রাউজারের পকেট থেকে ভাঁজ করা একখানা পত্রিকা বের করলেন। পুরোনো পত্রিকা, হাতে হাতে আরো জরাজীর্ণ হয়ে উঠেছে।

—বাট্ আই সাপোজ্ ইউ রোট্ দিস্ স্টোরি? 'রাতের তারা?'

রোমাঞ্চিত হয়ে গৌতম দেখল, তাই বটে। ছ মাস বয়েসের মধ্যেই অকালমৃত একটি মাসিক পত্রিকা। এই কাগজে 'রাতের তারা' সে লিখেছিল বটে। বেশ বড় গল্প। একজন উন্নাসিক বন্ধু পড়ে বলেছিল, 'চীপ রোমান্টিক্ স্টাফ্। তবে নট্ আন্-ইন্টারেস্টিং।' সোজা-সুজি ইন্টারেস্টিং কথাটা স্বীকার করতে তার মুখে বেধেছিল।

বিহ্বল হয়ে গৌতম বললে, হ্যাঁ, ওটা আমিই লিখেছিলুম। ও কাগজ তো কবে মরে গেছে। পেলেন কোথায়?

বিশু জোয়ার্দার প্রায় স্বর্গীয় হাসি হাসলেন।

—আমাদের খোঁজ করতে হয় স্যার। সেই যে বলে না?— 'যেখানে দেখিবে ছাই—উড়াইয়া দেখ তাই?' ওটা আমাদেরও মটো।

গৌতম ঢোক গিলে বললে, তা ও গল্পটা—

বিশু জোয়ার্দার বললেন, আমরা কিনব ঠিক করেছি, ছবি করব। আমিই ডিরেক্‌শন দেব।

গৌতমের হৃৎপিণ্ড আবার লাফিয়ে উঠল শূন্যের দিকে। তবে এবার আর আছড়ে পড়ল না মাটিতে, অপরিসীম বিস্ময়ে ত্রিশঙ্কুর মতো ঝুলতে লাগল মাঝ পথে।

—বলেন কি!

বরেন সাঁতরা বললেন, আমাদের খুব ভালো লেগেছে স্যার প্লটটা। বিশেষ করে আপনার হিরোয়িনের ক্যারাক্টার! কী একখানা মেয়েই তৈরি করেছেন স্যার—গোটা অডিয়েন্সকে স্রেফ্‌ জুতিয়ে দেবে।

সার্টিফিকেট শুনে হাঁ করে রইল গৌতম। বাক্‌স্ফূর্তি হতে চাইল না।

ভ্রুকুটি করে বিশু জোয়ার্দার বললেন, তুমি থামো—লেট্‌ মী স্পীক্‌। তা দেখুন মিস্টার সান্ন্যাল, কজ্‌ উই হ্যাভ্‌ লাইক্‌ড ইয়োর স্টোরি ভেরি মাচ্‌—সেই জন্যে অনেক খুঁজে আপনার ঠিকানা জোগাড় করেছি। সম্পাদকের বাড়ী গিয়ে—পুরোনো একগাদা ফাইল ঘেঁটে তারপর আপনার এখানে আসছি। আপনি গল্পটা বেচবেন আমাদের?

বেকুবের মতো গৌতম বললে, কিন্তু ও গল্পটা কি বিশেষ ভালো? আমি তো—বলতে বলতে সে নিজেই থমকে গেল। সর্বনাশ, এ সে করছে কী! সাধা লক্ষ্মীকে ঠেলছে পা দিয়ে!

বিশু জোয়ার্দার আবার উঁচু দরের হাসি হেসে বললেন, দেখুন,

আপনাদের সাহিত্য আর সিনেমার গল্প এক নয়। যেটা হয়তো হাইক্লাস লিটারেচার—সেটাকে সিনেমায় চালাতে গিয়েই দেখলেন : ব্যাং! ক্লীন্ ফ্লপ্! আবার হয়তো সাহিত্য হিসেবে সিম্প্লি আন্‌রিডেব্‌ল—সেইটেই দেখবেন ছবিতে সুপারহিট্!

—সাহিত্যের বিচারে আমার গল্পটাও বোধ হয় সিম্প্লি আন্‌রিডেব্‌ল—তাই আপনারা ওটাকে ছবির জন্যে বাছাই করেছেন?—বলতে গিয়েই কথাটা বলতে পারল না গৌতম। সিনেমায় গল্প বিক্রী হওয়ার রোমাঞ্চিত সম্ভাবনায় রূঢ় প্রত্যুক্তি জিভের ডগার সামলে নিয়ে সংক্ষেপে বললে, অঃ।

—আপনি গল্পটা বেচবেন আমাদের?—বিশু জোয়ার্দার জিজ্ঞাসা করলেন আবার।

—নিশ্চয়—নিশ্চয়—।—বারকয়েক থতমত খেয়ে গৌতম বললে, কেন করব না?

—তা হলে আসুন আমাদের অফিসে। অলকাপুরী স্টুডিয়োতে এখন আমরা অফিস নিয়েছি, ওখানেই নতুন ছবির শুটিং হচ্ছে আমাদের। কাল সন্ধ্যে সাতটা নাগাদ আসুন—উই উইল্ বি এক্‌স্‌পেক্‌টিং ইউ।

কথা বলতে বলতে বাজারের সামনে এসে পড়েছিল গৌতম। হাত তুলে একটা চলন্ত ট্যাক্সিকে থামালেন বরেন সাঁতরা।

বিশু জোয়ার্দার বললেন, তাহলে আজ আর আপনার কাজের ক্ষতি করতে চাইনে। প্লীজ কাম্ টু-মরো অ্যাট্ সেভেন পি এম্—শার্প। অলকাপুরী স্টুডিয়ো স্টারলিট্ পিকচার্স।...

......গৌতমের ঘোর ভাঙল। ট্রাম কালীঘাটে পৌঁছেছে, গাড়ীর ভিড় খানিক পাত্‌লা হয়েছে এতক্ষণে। বসবার জায়গা পেল গৌতম। একটা ক্লান্ত নিঃশ্বাস ফেলে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে বসে পড়ল পেছনের ছোট সীটটায়।

ভারী সুন্দর চেহারার একটি মেয়ে ট্রামে উঠল। বেশ গর্বিত ভাবে এগিয়ে গেল লেডীজ্ সীটে। চলার একটা বিশেষ ভঙ্গি আছে, বসবার আগে চারদিকে দেখে নিলে একবার। মেয়েটি জানে তার ওপর চোখ পড়বেই।

ওই রকম সুন্দর চেহারা সুমতিরও ছিল—গৌতম ভাবল। বিয়ের সময় বন্ধুরা বলেছিল, তোর সৌভাগ্যে আমাদের হিংসে হচ্ছে! ঠিক কথা—নিজের সৌভাগ্যকে গৌতম নিজেও যেন সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারেনি। কতদিন রাত্রিতে ঘরের নীল আলোটার কোমল রহস্য দিয়ে মাখানো বিছানার ওপর, সুমতির অবিশ্বাস্য সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তারই যেন বলতে ইচ্ছে হয়েছে: এ স্বপ্ন—না মায়া, না মতিভ্রম! হয়তো চোখের পলক ফেলতে না ফেলতেই সুমতি আর থাকবেনা—ওই নীল আলোর মায়ার ভেতরে নিঃশেষে মিলিয়ে যাবে!

তাই তো গেল—মিলিয়েই তো গেল সব। ছেলেটা হয়ে মরে যেতেই কেমন সব বদলে গেল সুমতির। আজও ঘরের নীল আলোয় তার মুখ দেখে গৌতম। আচমকা শিউরে ওঠে শরীর। মনে পড়ে ডাক্তারের কথা: 'এখনো চেঞ্জে নিয়ে যান, বাঁচাতে পারবেন না তা নইলে।' সুমতির রক্তহীন মুখখানাকে কঙ্কাল করোটির মত দেখায়।

ঝাঝা। নীল দিগন্ত। জলে হাওয়ায় স্বাস্থ্য আর সৌন্দর্য। সেরে উঠবে সুমতি—আবার সুন্দর হয়ে উঠবে আগের মতো। ছুটি নিশ্চয় দেবে ভৌমিক। টাকাটাও আজই পাওয়া যাবে—কোনো সন্দেহ নেই তাতে। বরেন সাঁতরা বলে দিয়েছে।

……গৌতম সেদিন আনন্দে দুটাকার জায়গায় সাড়ে তিন টাকার বাজার করেছিল। কিন্তু আসল কথাটা সে তখনও সুমতি ছাড়া আর কাউকে বলেনি। সিনেমা কোম্পানিগুলোকে বিশ্বাস

নেই। শেষ পর্যন্ত কী করবে ওরাই জানে। শুধু বলেছিল সুমতিকে। রাত্রে শোওয়ার সময়।

—গল্প কিনলে ওরা অনেক টাকা দেয় শুনেছি।

সুমতি হেসেছিল।

—বেশ তো, বড় একটা বাড়ী করে ফেলো। একখানা মোটর গাড়িও সেই সঙ্গে।

—সত্যি ঠাট্টা নয়। কম করেও শ'পাঁচেক টাকা তো দেবেই। আর ও টাকা পেলেই সঙ্গে সঙ্গে তোমাকে চেঞ্জে নিয়ে যাব। আগে তোমাকে ভালো করতে হবে। তারপর আমার অন্য কাজ।

—বেশ তো,সুইজারল্যাণ্ডেই নিয়ে যেয়ো। আর কালই দরখাস্ত করে দিয়ো পাসপোর্টের জন্যে।—আবার মৃদু হেসেছিল সুমতি।

উত্তেজিত হয়ে গৌতম বলছিল, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না? আচ্ছা, দেখো কাল।

পরের দিন যথা সময়েই গিয়েছিল প্রায় বাতাসে ভাসতে ভাসতে। সেই অলকাপুরী স্টুডিয়োতে—স্টারলিট্ পিক্চার্সের অফিসে। ঠিক সন্ধ্যে সাতটায়—শার্প।

—আসুন—আসুন—

অভ্যর্থনার ত্রুটি হয়নি। বরেন সাঁতরা ছিলেন, বিশু জোয়ার্দার ছিলেন, অপরিচিত আরো জন কয়েক ছিল।—বসুন, চা খান। এই দেখুন কনট্রাক্টের ড্রাফ্ট্—কাঁপা হাতে ড্রাফ্ট্টা পড়ে দেখেছিল গৌতম। পাঁচশো নয়—সাতশো এক টাকা। সাঁতরা বলেছিল, আপনার ফার্স্ট স্টোরি স্যার—তাই কিছু কম দিচ্ছি। এ ছবি যদি হিট্ করে, তবে, পরের গল্পের জন্যে আপনাকে পুরোপুরি এক হাজারই দেব। তা ছাড়া আমাদের ওদিকেও খরচ আছে—ডায়ালগ্ রাইটার, সিনারিস্ট;—এদেরও দিতে হবে। আশা করি, আপত্তি করবেন না।

আপত্তি! গৌতম যেন আবু হোসেনের মতো স্বপ্ন দেখছিল।

বিশু জোয়ার্দার বলেছিল, তবে আর একটা কথা আছে মিস্টার সান্ন্যাল। আপনার ওই 'রাতের তারা' নামটা ছবিতে চলবে না। টু অব্‌স্কিয়োর। সিনেমার অডিয়েন্স্‌ আরো সোজা নাম চায়। তা ছাড়া—পারসোন্যালি—টু বি ক্যাণ্ডিড্‌—আমারও নামটা খুব ভালো লাগছে না। তারা তো রাতেরই হয় মশাই—আলাদা করে 'রাতের তারা' বলবার কী দরকার। ইফ ইউ ডোণ্ট্‌ টেক ইট্‌ আদারওয়াইজ্‌—নামটা বদলে নিতে চাই আমরা।

—বেশ তো, নিন বদ্‌লে। —প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরং আরো আপ্যায়িত হল গৌতম।

কিন্তু কণ্ট্রাক্‌ট্‌টা সেদিন সই হল না। প্রোডিউসার ঢাকার লোক—কলকাতা ঢাকা দু'জায়গাতেই তাঁর কী সব ব্যবসা আছে। সকালে হঠাৎ কী একটা জরুরি খবর পেয়ে প্লেনে ঢাকায় চলে গেছেন। তিনি না এলে কণ্ট্রাক্‌ট্‌ সই হতে পারে না।

জোয়ারদার বললেন, কাম্‌ নেক্‌সট্‌ থার্স্‌ডে ইভ্‌নিং। উনিই বলে গেছেন। ওই তারিখেই কণ্ট্রাক্‌ট্‌ সই হয়ে যাবে, চেকও পাবেন। কিছু ভাববেন না মশাই—আমাদের ফ্যাইন্যাল্‌ ডিসিশন হয়েই গেছে।

আজ সেই থার্স্‌ডে ইভ্‌নিং।

—গৌতম নড়ে উঠল। ট্রাম প্রায় খালি হয়ে এসেছে, গাড়িটা সাপের মতো বাঁক নিচ্ছে টালীগঞ্জের ডিপোর ভেতরে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছ'টা। সাড়ে ছ'টায় অ্যাপয়েণ্ট্‌মেণ্ট। এখান থেকে অলকাপুরী স্টুডিয়োতে যেতে মিনিট সাতেক লাগবে। অর্থাৎ আরও কুড়ি বাইশ মিনিট তার হাতে আছে—এক পেয়ালা চা খেয়ে নিতে পারে।

ট্রাম ডিপোর সামনেই একরাশ বীভৎস কাদা। পা পিছলে

পড়তে গিয়ে সামলে নিলে, একটা বাস 'নাকতলা' 'নাকতলা' বলে চিৎকার করতে করতে প্রায় গৌতমের নাকের ওপর দিয়েই বেরিয়ে গেল—আর একটু হলেই চাপা দিত। সাদার্ণ অ্যাভিনিউ আর লেকের স্বপ্নপুরী পার হলেই কলকাতা এক কদর্য নরক।

টিনের ছাউনি দেওয়া হরিজন চায়ের দোকানের বেঞ্চিতে গৌতম আসন নিলে।

—চা এক পেয়ালা—

—বিস্কুট দেব? গরম সিঙ্গাড়া?—নীল হাফ প্যাণ্ট আর ময়লা খাকী শার্টপরা 'বয়' জিজ্ঞাসা করল।

—না, কিছু দরকার নেই। শুধু চা।

কড়া বাদামী রঙ ধরা পুরোণো ন্যাকড়ার মধ্য দিয়ে চা-ঢালা হচ্ছে একটা ফুলকাটা কাচের গ্লাসে। গৌতম দেখতে লাগল। সস্তা চা-র বুনো আর উগ্র তপ্ত গন্ধ আসছে—ওর মধ্যে চামড়ার কুচি মেশানো আছে নাকি? মানুষ সম্পর্কে গৌতম সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল। মানুষ এইখানেই পশুর চাইতে উঁচু দরের জীব—জানোয়ারেরা আর যা-ই করুক, ভেজাল দিতে জানে না। গোরুর সাধ্য নেই—নিজে তার দুধে জল মেশায়।

চা এল।

চুমুক দেবার চেষ্টা করেই নামিয়ে রাখতে হল—গ্লাসটা অত্যন্ত গরম। একটা মাছি গ্লাসের গায়ে বসেই আবার উড়ে গেল। রাস্তার উপর একটা নেড়ী কুকুর গৌতমের মুখের দিকে পিঁচুটি পড়া ঘোলা চোখে তাকিয়ে কিছুক্ষণ ধরে প্রত্যাশায় ল্যাজ নাড়ছিল—হঠাৎ কা'র একটা লাথি খেয়ে কেঁউ কেঁউ করে ছুটে পালালো।

একটি ভিখিরী মেয়ে এসে হাত বাড়ালো। কোলে শিশুর আকারে রিকেটের বিজ্ঞাপন।

—আমারে অ্যাক্‌টা পয়সা ছান বাবা—খাইতে পাইনা বাবা—গরীবেরে অ্যাক্‌টা পয়সা বাবা—

দোকানদার বললে, মাপ করো।

দুটি লক্কা চেহারার ছোকরা সিগারেট টানছিল। একজন চোখের ভঙ্গি করে বললে, একটা পয়সা দেব? একটা টাকাই দিতুম বয়েস একটু কম হলে—

সঙ্গীটি খিক করে হেসে তার কাঁধে একটা থাবড়া পড়ল।

—আঃ, কী হচ্ছে মাইরি। চাদ্দিকে ভদ্দরলোক—দেখছিস নে? সখ থাকলে রাত্তিরে বরং শেয়ালদা স্টেশনে—

পাশ দিয়ে শব্দ করে লরী বেরিয়ে গেল। শেষ কথাটা শুনতে পেলো না গৌতম। খারাপ লাগে—ভারী খারাপ লাগে। সামনে থেকে চায়ের গ্লাসটা তুলে নিয়ে সে চুমুক দিলে, কোনো স্বাদ নেই—ধুতরোর মতো গন্ধওলা খানিকটা মিষ্টি মিষ্টি গরম জল। শুধু চায়ে কেন—জীবনের কোথাও কোনো স্বাদ নেই মনে হল গৌতমের। যতই চোখের সামনে পর্দা টেনে রাখতে চাই, একটুখানি হাওয়া লাগলেই সেটা উড়ে যায়—খুলে যায় নরকের প্রচ্ছদপট, মুখের ওপর কে যেন একরাশ দুর্গন্ধ কাদা ছিটিয়ে দেয়।

নীল দিগন্ত। শ্যামছায়াঘন পাহাড়ের গম্ভীর সারি। শালবনের কচি পাতার সুগন্ধ। রাঙা মাটির পথ। সুমতি আবার আগের মতো সুন্দর হয়ে উঠেছে। বেড়িয়ে ফিরতে ফিরতে রাত হল—চাঁদ উঠল শালবনের ওপর, পায়ের তলার মাটিটা যেন চন্দনে মাখামাখি হয়ে গেল। বাতাসে আপনিই ভেসে উঠল সুর:

"যেতে যেতে পথে পূর্ণিমা রাতে
চাঁদ উঠেছিল গগনে,
দেখা হয়েছিল তোমাতে আমাতে—"

কিন্তু সুর কেটে গেল। পূর্ববঙ্গের এই মেয়েটা—'অ্যাকটা

পয়সা ছান বাবা।' শিয়ালদা স্টেশন—মনুষ্যত্বের অকথ্য অপমান। উদ্বাস্তুর দল—গৌতমের নিজের দেশের মানুষ। সুন্দরবন অঞ্চলের নিত্য দুর্ভিক্ষ। চাষীর মেয়ে আঁচল পেতে বসে আছে কলকাতার ফুটপাথে; অসহ্য ক্ষিদেয় চোখের দৃষ্টি তার ঝাপসা হয়ে আসছে; স্বপ্নের ঘোর-লাগা চোখে দেখছে তার মরাইভরা ধান নবান্নের জন্যে অপেক্ষা করে আছে, তার গোরুর পালানে টস্ টস্ করছে ক্ষীরের মতো দুধ—তার সংসারের জন্যে, তার সন্তানের জন্যে, তার স্বামীর জন্যে! পেটের যন্ত্রণায় একটু পরেই স্বপ্ন ভাঙে। শহর কলকাতা। ধান দূরে থাক, এক মুঠো নরম মাটি পর্যন্ত নেই কোথাও। ওদিকে বেকারের আত্মহত্যার খবর আসে—লিলুয়া স্টেশনের কাছে কে যেন চলন্ত ট্রেণের সামনে ঝাঁপ দিয়ে পড়েছে—শরীরটা তাব আর চেনা যায় না—একরাশ রক্তমাংসের কদাকার পিণ্ড একটা। আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়ে সেই মানুষটা মরবার আগে হাঁপাতে হাঁপাতে বলছে: ভাত—এক মুঠো ভাত।

হিংস্রভাবে আবার বিস্বাদ চায়ে চুমুক দিলে গৌতম। অকারণে তার একটা কুৎসিত গাল দিতে ইচ্ছে করছে। এই চায়ের দোকানটাকে—রাস্তার ওই কুকুরটাকে—পথের পাশে সঞ্চিত বীভৎস কাদাকে—আর নিজেকে। কোথাও মুক্তি নেই—কোথাও নেই নিঃশ্বাস ফেলবার জায়গা। চাবপাশ থেকে কতগুলো নোনাধরা কানা দেওয়াল নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে, একটু পরেই বুকের ওপরে চেপে বসবে।

একটুখানি আকাশ। এক মুঠো ছুটি। এক ঝলক গানের সুর। কত সামান্য এই দাবি—কত অপরিহার্য। অথচ কে যেন চাবুক মারে। শেয়ালদা স্টেশন। তার দেশের মানুষ। কলকাতার ফুটপাথে আঁচল-বিছানো বাংলা দেশের মা। রক্তমাংসের তালগোল পাকানো একটা শরীর পড়ে আছে রেল লাইনের ধারে।

আত্মহত্যা। বুকের মধ্যে থেকে মরণান্তিক কান্নার মতো কী একটা কাঁপতে কাঁপতে উঠে এসে জিভের সামনে থমকে যায়। মাথায় রক্তের ঢেউ আছড়ে পড়ে। খুন করতে ইচ্ছে হয় গৌতমের, নইলে নিজের গলা টিপে ধরতে।

ভুলতে দাও—কিছুক্ষণের জন্যে ভুলতে দাও। সুন্দরবনের ওই চাষী বৌটিও কলকাতার ফুটপাথে বসে নবান্নের স্বপ্ন দেখছে। আমরাও স্বপ্ন দেখি খানিকক্ষণ। আকাশের নীল রঙ আমাদের চোখেও নীল কাজল পরিয়ে দিক; শেয়ালে-খাওয়া বুনো-হাঁসের রক্ত-মাখানো পালকগুলো জ্যোৎস্নার মরাল হয়ে উড়ে যাক; সবুজ কপোতের মতো আমরাও কোনো পিয়ালের ডালে নীড় বাঁধি এক ফালি বসন্তের মধ্যে। আমি আর সুমতি। তারপর।

ভৌমিক সাহেব। ব্রজেন দস্তিদার। অনিল মৈত্র মরে যাবে তিলে তিলে। ইউনিয়ান। মা-র দিনরাতের অভিযোগ। মাসের শেষে সাতটা দিন। চাঁদ উঠলে, পাশের বাড়ীর একটি ছেলে অনেক রাতে আশ্চর্য বাঁশি বাজালেও সুমতি জাগবে না; দশটা-পাঁচটা চাকরির পরেও টিউশনের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে সে; চল্লিশ বছর হতে না হতেই মাথার অর্ধেক চুল শাদা হয়ে যাবে।

এক চুমুকে চা-টা শেষ করে ফেলল গৌতম। কী হবে এ-সব কথা ভেবে? এককালে গল্প লিখত বলেই কি জীবনকে এখনো সে শাদা চোখে দেখতে পায় না? জটিলতার রন্ধ্রপথে যন্ত্রণার সন্ধান করে বেড়ায়? মানুষ যার কাছ থেকে চোখ বুজে পালাতে চায়, উপযাচক হয়ে তারই কি অনুসরণ করে গৌতম?

অথচ সমস্তটাই অত্যন্ত সহজ। স্ত্রীকে নিয়ে ঝাঝায় যাওয়ার ব্যবস্থা করছে সে। টাকার দরকার। আর আজই সেটা পাওয়া যাবে। চুরি-জোচ্চুরি করে নয়—সিনেমার গল্প লিখে। দালালীর ছিচকে টাকাও নয়, দস্তরমতো কুলীন ব্যাপার। কেন মিথ্যে

টালীগঞ্জের এই চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে একরাশ কাদার দিকে চোখ রেখে এইসব তত্ত্বচিন্তা করে চলেছে সে ?

ঘড়ির দিকে চোখ পড়ল। ছটা একুশ।

এখুনি উঠতে হবে—ঠিক সাড়ে ছটায় যাওয়ার কথা। এতক্ষণের সমস্ত ভাবনাগুলোকে কাকের পাখার বৃষ্টিবিন্দুর মতো ঝেড়ে ফেলে দিয়ে গৌতম উঠে দাঁড়াল। একটা দু আনি ছেলেটার হাতে গুঁজে দিয়ে নেমে পড়ল রাস্তায়।

স্টুডিয়োর গেটের মুখেই গৌতমের পাশ কাটিয়ে বড় একখানা মোটর গাড়ী ঢুকল ভেতরে। গৌতমের দৃষ্টি চকচক করে উঠল একবার। গাড়ীতে বসে আছেন বাংলা ফিল্মের এমন একজন অভিনেত্রী—যাঁর নামে ছেলে-ছোকরাদের রক্তে দোলা জাগে। তাঁকে সশরীরে স্বচক্ষে দেখে গৌতমও ধন্য হল।

ইনি কি তাব ছবিতে নামবেন ? নায়িকা হয়ে ? রোমাঞ্চ হল।

গেট পার হয়ে গাড়ী স্টুডিয়োব ভিতর দিকে এগিয়ে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে সেদিকে তাকালো গৌতম। আজ হয়তো ওঁর শুটিং আছে।

গেটের পরেই সাবি সারি অফিস। তাবই একটি 'স্টারলিট্ পিক্চার্স।'

ডিবেক্টার নেই, বরেন সাঁতরা নেই—কেবল একটি ছোকরা অ্যাসিস্ট্যাণ্ট বিজন এক পেয়ালা চা সামনে নিয়ে শক্ত কড়া ফ্রেঞ্চ টোস্ট দাঁত দিয়ে ছেঁড়বার চেষ্টা কবছিল।

ভরাট মুখে বিজন বললে, আসুন গৌতমবাবু, বসুন।

গৌতম বসল।

—ওঁরা সব কোথায় ?

—বলছি।—ফ্রেঞ্চ টোস্টের একটা বড় সাইজের টুকরো ছিড়ে

নিয়ে বিজন পরিতৃপ্তভাবে কিছুক্ষণ সেটা চিবুল। তারপর বললে, চা খাবেন ?

—ধন্যবাদ—দরকার নেই। এখুনি খেয়ে আসছি।

—তা হলে বসুন একটু। সিগারেট খান।—বিজন একটা ছোট প্যাকেট এগিয়ে দিলে।

—থাক।

বিজন চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, ওঃ, নিজাম-ব্র্যাণ্ড চলে না বুঝি ?

—কোনো ব্র্যাণ্ডই চলে না।—গৌতম হাসল : আমি সিগারেট খাই না।

—যাক্, বেঁচেছেন। খরচা করে ক্যান্সার ডেকে আনছেন না !—বিজন চায়ে চুমুক দিলে : আমি আপনার জন্যেই বসে আছি। মিস্টার জোয়ারদার আর বরেনবাবু ফিল্মের জন্যে কোডাকে গেছেন। ফিরতে দেরী হবে একটু।

সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে গেল গৌতম।

—কিন্তু আজকে কন্ট্রাক্ট্টা—

—জানি, সই হওয়ার কথা ছিল।—ফ্রেঞ্চ টোস্টের বাকী টুকরোটা নিঃশেষ করল বিজন : কিন্তু ওটা আজ হবে না।

গলা ধরে এল গৌতমের। বিজনের ঠোঁটের দুপাশে রুটির গুঁড়ো লেগে আছে বিশ্রীভাবে—গৌতম সেদিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর চিঁ চিঁ করে বললে, কেন ? মিস্টার সাহা ঢাকা থেকে ফেরেন নি ?

—ফিরেছেন। তিনিই বললেন, আজ যে বিষুদ্বারের বার-বেলা সেটা আগে তাঁর খেয়াল ছিল না। একটা শুভকাজ দিনক্ষণ দেখে করাই ভালো। তাই কাল আপনাকে আসতে বলেছেন।

—কাল ?

—হাঁ—ঠিক এই সাড়ে ছ'টাতেই। মিস্টার সাহাও আসবেন।

গৌতম চুপ করে বসে রইল। কাল! এই কাল একটা দুঃস্বপ্নের মতো তাকে পেয়ে বসেছে। অফিসে ভৌমিক সাহেব বলছেন, কাল—বিশু জোয়ারদার বলছে কাল। কিন্তু কেমন করে বোঝাবে গৌতম, আজ সারা রাত সে ঘুমুতে পারবে না, অস্বস্তিতে ছটফট করবে, অনিশ্চয়তার যন্ত্রণায় তার মাথার শিরাগুলো ছিঁড়ে যেতে চাইবে। এর চেয়ে মুখের ওপর সোজাসুজি 'না' বলে দিলে সে মুক্তি পেত—একটা কিছু নিশ্চয়ভাবে জেনে নিশ্চিত হয়ে যেত।

ফস্ করে গৌতম প্রশ্ন করল: একটা কথা বলতে পারেন বিজনবাবু?

বিজন খাওয়া শেষ করে নিজাম্স্ ব্র্যাণ্ড ধরাচ্ছিল। তার সিগারেটের খানিকটা তীব্র উগ্রগন্ধ ধোঁয়া গৌতমের মুখে এসে আছড়ে পড়ল।

—কী বলুন তো?

—আপনারা সত্যিই কি আমার গল্প নিয়ে ছবি করবেন?

বিজন আশ্চর্য হয়ে বললে, কেন, সেই রকমই তো কথা আছে। আপনার কি এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না নাকি?

ক্লান্তভাবে গৌতম বললে, সিনেমা কোম্পানি সম্পর্কে অনেক রকম গুজব শুনেছি কিনা। না আঁচানো পর্যন্ত নাকি তাঁদের বিশ্বাস নেই। কখন যে তাঁরা ফস করে মত বদলে বসবেন সে নাকি তাঁরাই জানেন—

—তা যা বলেছেন।—বিজন হেসে উঠল: এখানে অনেক রকম কাণ্ড হয়। হয় তো লাস্ট মোমেন্টে কেউ একটা অত্যন্ত বাজে গল্প দিয়ে ডিরেকটার কিংবা প্রোডিউসারকে ভজিয়ে ফেললে—গেল আপনার ভালো গল্পটা।

—সে রকম সম্ভবনা এখানেও আছে নাকি?

বিজন হাসতে লাগল : বোধ হয় নেই। ওটা ঠিকই আছে বলে শুনেছি। তবে—এ লাইনের ব্যাপার, জোর করে কিছুই বলা যায় না—বুঝলেন না? যা হোক, কাল আপনি আসছেন তো?

—আসব। আচ্ছা, নমস্কার—

শরীরে কয়েক মণ ক্লান্তির ভার টেনে গৌতম উঠে দাঁড়ালো।

—এক মিনিট। একটা কথা বলছিলুম।—বিজনও সঙ্গে সঙ্গে উঠে পড়ল।

—কী বলবেন?

বিজন অন্তরঙ্গভাবে গৌতমের পাশে এসে দাঁড়ালো। তারপর ফিস ফিস করে, প্রায় চক্রান্তকারীর গলার আওয়াজে বললে, আপনি স্যার আমাকে একটা গল্প দেবেন?

—আপনাকে?

—হাঁ, আমি একবার একটা ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট ছবি করবার চান্স খুঁজছি। একটা পার্টিকে প্রায় কায়দা করেছি, কিন্তু নতুন বলে আমাকে বিশেষ আমল দিতে চাইছে না। তবে জুৎসই একটা গল্প যদি পাই তা হলে ঠিক গেঁথে ফেলব। দেবেন আমাকে?

গৌতম খুশি হল না, বরং বিরক্তি বোধ করল।

—কিন্তু আমি তো আজকাল আর গল্প লিখি না।

—আরে মশাই, লিখতে কতক্ষণ?—গৌতমের মুখে আবার নিজাম্‌স্‌ ব্র্যাণ্ডের একরাশ দুর্গন্ধ ছড়িয়ে বিজন তাকে উৎসাহ দিতে চেষ্টা করল : আপনাদের আর কী! কলম নিয়ে বসলেই তর্‌ তর্‌ করে বেরিয়ে আসবে। দেবেন লিখে?

—চেষ্টা করব।

—কিন্তু ওই 'রাতের তারার' মতো লাভ-স্টোরি নয়—বুঝলেন? —বিচক্ষণ ভঙ্গিতে বিজন বললে, আমার ফার্স্ট পিকচার, বুঝতেই পারছেন আমি কোন রিস্‌ক্‌ নিতে পারব না। একটা ক্রাইম

স্টোরিই করবেন। বেশ কিছু আউটডোর দেবেন—যাতে দিল্লী-আগ্রা মথুরা বেশ ঘুরে আসা যায়, নিজের পয়সায় ওদিকে তো আর যেতে পারছি না। আর এমন কয়েকটা নাচ গানের সিচুয়েশন দেবেন, যাতে—বুঝলেন না ?

—বিলক্ষণ। সবই বুঝেছি।—গৌতম সংক্ষেপে সবটা থামিয়ে দিয়ে বললে, আমি ভেবে দেখব। আজ তা হলে বরং চলি বিজনবাবু।

—কাল আসবেন।

—আসব বই কি। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আশা ছাড়তে নেই।—গৌতম বিস্বাদ হাসি হাসল।

—আমার গল্পের কথাটা ?

—তাও মনে থাকবে।

গৌতম বেরিয়ে এল। অলকাপুরী থেকে আবার পৃথিবীর মাটিতে। সেই কাদায়—সেই দারিদ্র্যে, সেই দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু আর আত্মহত্যার জগতে।

নাকতলার একখানা যাত্রী বোঝাই বাস এবার আর তাকে ক্ষমা করল না। পথের ময়লা জল এসে তার একপাটি জুতোর ওপর ঢেউ খেলল।

আবার কুৎসিত ভাষায় খানিকটা গালাগালি করবার একটা বিকৃত বাসনা গৌতমের জিভের কাছে উদ্যত হয়ে এল। কটূক্তি করতে ইচ্ছে হল এই স্টুডিয়োকে, সেই চিত্ত চমৎকারিণী অভিনেত্রীকে, অলকাপুরীর বাইরের এই বাস্তব নরককে, সেই ভিখারী পূর্ববঙ্গের মেয়েটাকে। আর নিজেকেও।

গৌতম চলতে শুরু করল।

বাড়ী ?

না—বাড়ীতে নয়। হঠাৎ মরীয়া হয়ে উঠেছে সে।

আজ রাত্রে যা হোক একটা কিছু করতেই হবে তাকে। এই অনিশ্চয়তার দুঃস্বপ্ন আর সে সইতে পারবে না। সারা রাত মাথার ভেতরে অসংখ্য কীট তার মস্তিষ্ককে কুরে কুরে খাবে, রাত জাগা ঘড়িটার শব্দ তাকে ঠাট্টা করবে, সুমতির প্রত্যেকটা নিঃশ্বাস অন্তিম নিঃশ্বাসের মতো তার ফাঁপা পাঁজরের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসবে—অসম্ভব। এ অসম্ভব।

আজ রাতে গৌতমের নিশ্চিন্ত হওয়া দরকার। যেমন করে হোক—যে-কোনো উপায়ে হোক।

ট্রামে উঠে পড়ে, একেবারে সামনের সীটে গা এলিয়ে দিয়ে সে চোখ বুজল।

ধরো—আজ যদি চাকরি যায়? যদি অফিসে ধর্মঘটের নোটীশ পড়ে, যদি তার নেতৃত্ব নিয়ে ছাঁটাই হয় গৌতম, যদি হাজার আন্দোলনের ফলেও সে যদি চাকরি আর না-ই পায়, তা হলে কি সঙ্গে সঙ্গেই হাল ছেড়ে দেবে?—অনাহারে হাত-পা ছেড়ে দিয়ে ঘরে এলিয়ে পড়ে থাকবে মৃত্যুর প্রতীক্ষায় আর ছাদের কড়িকাঠ গুণে চলবে?

না—কিছুতেই নয়।

তখন আবার বাঁচবার চেষ্টা করবে গৌতম। শুরু করবে নতুন ভাবে।

মনে করা যাক—ভৌমিক ছুটি দিলে না। রাগ করে সে রিজাইন্ দিলে। ফিল্ম কোম্পানিও শেষ পর্যন্ত তার গল্প কিনল না—কাল এসে শুনল—তারা মত বদলে ফেলেছে। তখন কী করবে গৌতম? হার মানবে? চোখের সামনে তিলে তিলে মরে যাবে সুমতি, আর সে পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে তা দেখবে—শুধু দেখেই যাবে?

না।

ছুটি যদি না পাওয়া যায়—ফিল্ম কোম্পানি যদি টাকা না-ই দেয়, তা হলেও কি সুমতিকে নিয়ে সে শনিবার ঝাঝার পথে বেরিয়ে পড়তে পারে না ? এত বড় কলকাতা শহরে কি এমন কোন উপায় যে নিজের এই প্রয়োজনটুকু সে মিটিয়ে নিতে পারে ?

তখন বিদ্যুৎ চমকের মতো মনে পড়ল বিলাস মজুমদারকে।

কণ্ডাক্‌টার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। গৌতম পয়সা বের করে নিয়ে বললে, বালীগঞ্জ।

ভারী আশ্চর্য। বিলাসের কথা কেন যে এতক্ষণ তার মনে পড়েনি !

স্টেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের সেই দিনগুলো। দুপুরের রোদে ছায়াভরা পার্ক স্ট্রীট্‌ ঝিম্‌ ঝিম। তখনো কলকাতায় ট্রাফিকের ভীড় এত বাড়েনি। যুদ্ধের সেই অনেক আগে এমনভাবে পিঁপড়ের মতো মোটর ছুটোছুটি করত না, বেলা দুটোর পার্ক স্ট্রীট্‌ দিয়ে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে পথ চলা যেত। আলোছায়ার ভেতরে পুরানো সেমিটারীর শ্যাওলা ছাওয়া টুমগুলো রোমক যুগের আমেজ জাগাত মনে।

—পাউণ্ডের নতুন ক্যাণ্টোজ দেখলি গৌতম ?

—দেখলাম। বিশেষ বোধগম্য হল না।

—পাউণ্ড বোঝবার জন্য নয়—অলসভাবে একটা সিগারেট ধরিয়ে বিলাস বলত : ওর কবিতা পড়তে পড়তে মনে হয় যেন অদ্ভুত একটা রাস্তা দিয়ে চলেছি। সে পথের দুধারে এই টুম-গুলোর মতো—না, এদের চাইতেও অনেক বড়ো—হেলেনিক-রোম্যান-ভারতীয়-ইহুদি অসংখ্য অজস্র মন্দির-আলটার-সিনাগগের ধ্বংসাবশেষ। নিবিড় কুয়াশায় তারা ঢাকা, স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না, অথচ কী একটা মহিমার আভাস তারা বয়ে আনে। আর

মধ্যে মধ্যে কোথা থেকে অশরীরী কোরাসেরা গান গেয়ে ওঠে—কী একটা ট্র্যাজেডীর অভিনয় হচ্ছে ডায়োনিসাসের সামনে, তাদের গানের ভাষা বোঝা যায় না—হিব্রু-গ্রীক্-ল্যাটিন-সংস্কৃত সব কিছু মিশে যেন একটা ম্যাজিক ওয়ার্লড্—

গৌতম থামিয়ে দিত : কাব্য রাখ বিলাস। ওসব সূক্ষ্ম অনুভূতি আমার পোষায় না। তার চাইতে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বার্নার্ড শ'র কথা বল্। আমার কিন্তু মনে হয়—

কী মনে হয়, সেকি আজ আর মনে আছে গৌতমের। পার্ক স্ট্রীটে সে ছায়া আর নেই—সে নির্জনতাও না। তার সঙ্গে কোথায় গেছে ক্যাণ্টোজ থার্টিসেভেন আর ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের বার্নার্ডশ, স্পেণ্ডার আর ডাইলান টমাসের কবিতা, অডেন-ইশেরউডের নতুন নাটক।

যেটুকু বাকী ছিল, শেষ গল্পের সঙ্গে তারও তিলাঞ্জলি দিয়েছে গৌতম। এখন চাকরি। সুমতি। মা। ছুটি। অনেক রাতের তারার সুর-মেশানো 'রাতের তারা' এখন সিনেমার বাজারে আত্ম-পশারিণী। পাউণ্ডের একটা লাইনও এখন আর মনে পড়ে না, অডেন-ইশেরউডের নাটক ভুলে গিয়ে এখন গৌতম বাংলা সিনেমার যে-কোনো ছবি দেখে।

আর বিলাস?

বিলাস গাড়ী হাঁকায়। দু'শো টাকা করে মাসে ক্লাবের চাঁদা দেয়। অনেক রকম ব্যবসা করে—মিশন রো এক্সটেন্শনে তার জম্জমাট অফিস। বিয়ে করেনি—হয়তো প্রয়োজনও হয় না। বয়স বাড়লে, ক্লান্তি এলে, তারই মতো একজন ক্লান্ত সঙ্গিনীকে বেছে নেবে। গৌতমের মনে আছে, তার বিয়ের নেমন্তন্নের চিঠি পেয়ে ছাত্রজীবনের চেনা রসিকতাটার পুনরুক্তি করে বলেছিল, Marriage is a romance in which the hero 'dies in the first chapter!

গৌতম হেসে বলেছিল, আমি হিরো নই, বিয়ে আমার কাছে রোমান্সও নয়।

—বিশুদ্ধ মনুসংহিতা? পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা? একেবারে অধঃপাতে গেছিস গৌতম।

গৌতম অধঃপাতেই গেছে। কিন্তু চমৎকার আছে বিলাস—মৃত্যুহীন নায়ক। অবন্ধনের আনন্দে—কাঞ্চন কৌলীন্যের সৌভাগ্যে।

মাস দুই আগে চৌরঙ্গীতে দেখা হয়েছিল একবার।

বিলাসের হাতে খানতিনেক নতুন চকচকে বই। পুরোনো অভ্যাসবশেই গৌতম জিজ্ঞাসা করেছিল: পড়ার হ্যাবিট এখনো রেখেছিস বিলাস?

বিলাস হেসে বলেছিল, ও, নাথিং ভেরি সিরিয়াস। ওগুলো মিকি স্পিলেনের লেটেস্ট ক্রাইম স্টোরিজ। কী দারুণ যে লেখে লোকটা। পৃথিবীতে এখন দুজন লোক হচ্ছে সব চাইতে বড় সেন্‌সেশন—একজন নিকিতা ক্রুশ্চেভ, দ্বিতীয় লোকটি হচ্ছে মিকি স্পিলেন!

গৌতম হাঁ করে তাকিয়ে ছিল কিছুক্ষণ—জবাব দিতে পারেনি।

বিলাস পিঠে একটা থাবড়া দিয়ে বলেছিল, এনিওয়ে—তোর বোধ হয় তুলনাটা ভালো লাগল না, তোরা আবার সিরিয়াস্ লোক। (পার্ক স্ট্রীটের পথ দিয়ে দুপুরের ঝিম্‌ঝিম্ ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে কী বলত বিলাস মজুমদাব? গৌতম ভাবতে ভাবতে চেষ্টা করল) তা কী করছিস এখন? সেই চাকরি?

—কী আর করা।

—দূর, কেরাণীগিরিতে কী হবে?—বিলাস সিগারেট বাড়িয়ে বলেছিল, নে।

—থাক, ছেড়ে দিয়েছি।

—ঘোর সিরিয়াস? তোকে নিয়ে আর পারা গেল না।—করুণার হাসি হেসে বিলাস মজুমদার বসেছিল, কী বলছিলুম? হ্যাঁ—হ্যাঁ—কী হবে কেরাণীর চাকরিতে? আমার সঙ্গে বিজনেস্ কর না?

—টাকা পাব কোথায়?

—টাকা লাগবে না। তোকে ওয়াকিং পার্টনার করে নেব। আয় না—

—দেখি ভেবে—

বিলাস পিঠে আবার থাবড়া দিয়ে বলেছিল, দেখিস ভেবে।

ট্রাম টালীগঞ্জের ব্রীজের তলা দিয়ে চলেছে। সেই পচা পাঁকের এক ঝলক দুর্গন্ধ ভেসে এল। আজ পৃথিবীটাই পঙ্কিল।

গৌতম ভাবল, দেখিই না আজ একবার। বেশ তো, ছেড়েই দেব না হয় চাকরি। এই দিন-অন্নের দীনতা, ছুটির জন্যে এই কাঙালবৃত্তি, বিশু জোয়ার্দারের এই ভিক্ষামুষ্টি। সব ছেড়ে দেব। বিনা টাকাতেও ওয়ার্কিং পার্টনাব হওয়া যায়। ব্যবসা। স্বাধীনতা স্বাচ্ছন্দ্য প্রাচুর্য।

ব্রীজের পর দ্বিতীয় স্টপে নামল গৌতম।

চওড়া রাস্তা ডান দিকে। ছাড়া-ছাড়া ফিটফাট বাড়ী। দুটো একটা গাছ। স্নিগ্ধ আলোর সারি। লেকের হাওয়া কৃষ্ণচূড়ার পাতায় খেলা করছে খুশিতে।

ফটকে আইভি লতা। নামের বোর্ড। বি, মজুমদার—ইন্। কলিং বেলটা আঙুলের ডগায় টিপে ধরল গৌতম। অনেক দূরে যেন প্রলম্বিত লয়ে একটা টেলিফোনের ঘণ্টা বাজল।

নেপালী চাকর এসে দাঁড়ালো দোর গোড়ায়।

—বাবুকে খবর দাও।

কার্ডের প্রত্যাশায় সেকেণ্ড দশেক দাঁড়িয়ে থেকে চাকরটা বললে, কী নাম বলব ?

—গৌতম সান্ন্যাল।

ছ মিনিটের মধ্যেই পা-জামা পাঞ্জাবীপরা বিলাসের আবির্ভাব।

—হ্যাল্লো—হ্যাল্লো! —হাত চেপে ধরে টানতে টানতে পাশের ড্রয়িং রুমে নিয়ে গেল। পাখা খুলে দিয়ে সোফায় বসিয়ে এক গাল হেসে বললে, শেষ পর্যন্ত এলি এতদিন পরে ?

—তোব সঙ্গে একটু দরকার ছিল ভাই।

—হচ্ছে, হচ্ছে—বিলাস চিৎকার করে বললে, মাইলা—চা দে।

নেপথ্য থেকে শোনা গেল : জু।

—তারপর—ব্যাপার কী ?—টেবিল থেকে সিগারেটের টিন তুলে নিয়ে বিলাসের জিজ্ঞাসা।

—তোর প্রস্তাবটার কথা ভেবে দেখলুম।

—কোন্ প্রস্তাব ?—বিলাস ভুরু কোঁচকালো।

—সেই যে বলেছিলি, তোর বিজনেসে আমাকে ওয়ার্কিং পার্টনার—

—ওহো—নাউ আই রিমেম্বার।—বিলাস হাসল : আরে, তোকে পার্টনার করতে পারলে তো ভালোই হত। তা তুই আবার সাহিত্যিক মানুষ—এসব তোর সত্যিই কি পোষাবে ? পার্টি, ট্রান্জাক্শন, কনসাইন্মেন্ট, কণ্ট্রাকট্, পার্সেণ্টেজ—রাতদিন কচ্কচি—ভালো লাগবে ?

গৌতম সামনের টিপয় থেকে কৃষ্ণনগরের একটা ছোট মাটির পুতুল তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বললে, কেন ভালো লাগবে না ? অফিসে যা লিখতে হয়, তাতেও কাব্যের বালাই থাকে না।

—ক্লার্ক হওয়া এক, পার্টনার হওয়া আর এক জিনিশ।—বিলাস সিগারেট ধরিয়ে পাখার হাওয়ায় ধোঁয়া ছড়িয়ে দিলে :

ইউ নো, কেরাণীর দায়িত্ব দশটা-চারটেতেই শেষ, হাতের কাজ মিটে গেলেই ইউ আর এ ফ্রী-ম্যান। কিন্তু টু বি অ্যান্ অফিস বস্—ছাট্ ইজ্ র্যাদার ডিফারেন্ট। সকাল আটটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত অফুরন্ত কাজ—আজ দিল্লী, পরশু বম্বে, নেকস্ট্ ডে হয় তো জালন্ধর কিংবা কয়েম্বাটুর। বুঝতেই পারছিস কী বিশ্রী ঝামেলা।

গৌতম চুপ করে রইল। বিলাস শেষ পর্যন্ত কী বলবে, তার আভাস এর মধ্যেই পেয়েছে সে। তবুও বিলাসের মুখ থেকে শোনবার জন্যেই অপেক্ষা করতে লাগল।

—মাঝে মাঝে মনে হয় কি জানিস?—উদার ভাবে বিলাস বললে, অফিস-মাস্টার না হয়ে আমি যদি একটা পেটি ক্লার্ক হতুম, অনেক বেশি সুখী হতে পারতুম তা হলে। ক্যান ইউ বিলিভ, গত সপ্তাহে একবার সিনেমা দেখতে পাইনি, অথচ এস্থার উইলিয়াম্সের ছবি চলে গেল।

কেন কে জানে, হঠাৎ 'আহা বাছা রে' বলে বিলাসের চোখ দুটো মুছিয়ে দিতে ইচ্ছে হল গৌতমের। কী কষ্ট! কী কষ্ট! এস্থার উইলিয়াম্সের ছবি না দেখতে পারার বেদনা ভুক্তভোগী না হলে কে বুঝবে। ওকে ভালো করে সান্ত্বনা দেওয়া উচিত। কিন্তু তার আগেই চা বিস্কুট নিয়ে মাইলা প্রবেশ করল।

টি-পট থেকে চা ঢালতে ঢালতে বিলাস বললে, তা ছাড়া ভাই, মাঝে মাঝে এমন সব ডার্টি এলিমেন্ট্ নিয়ে হ্যাণ্ডেল্ করতে হয় যে জীবনে ঘেন্না ধরে যায়। মানুষ যে কত সেল্ফিশ হতে পারে—

(এত সাধারণ, এত বহু-ব্যবহৃত কথা বলছে কোন্ বিলাস মজুমদার? পুরোনো সেমিটারীগুলোর সঙ্গে অতীতের

অ্যালেকজান্দ্রিয়ার কী সম্পর্ক আছে? 'আক্রেদিতে' পড়লি? আমার কিন্তু চীপ রোমান্স মনে হল। আচ্ছা—মডার্ণ রাইটাররা জেম্স্ জয়সের মতো ইণ্টেরিয়র মনোলগ্ ব্যবহার করেনা কেন? এদের কথাগুলো এত পুরানো হয়ে গেছে। নিউ সেট অব ওয়ার্ডস—হাফ কনশাস্নেস—সাইকোলজিক্যাল উপন্যাস হবে স্লিপ-ওয়াকিঙের মতো—

সেই পার্ক স্ট্রীট আর নেই। এখন সেখানে ক্রুদ্ধ কটাক্ষে তাকিয়ে আছে ট্রাফিক সিগ্ন্যালের ত্রিনেত্র। গাড়ীর পর গাড়ী। বুড়ো এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ভিখারীটা চাপা পড়ল চকচকে একটা নতুন ইউটিলিটি ভ্যানের তলায়। কিংবা ভিখারী নয়—গৌতম নিজেই—ভ্যানটা কে চালাচ্ছে—বিলাস?)

গৌতম চমকে উঠল। চায়ের পেয়ালা সামনে এগিয়ে দিয়ে বিলাস বললে, চোখ বুজে কী ভাবছিলি রে? ঘুম পাচ্ছে নাকি?

—ঘুমই বটে। স্বপ্ন দেখছিলুম—গৌতম অপরিচ্ছন্ন ভাবে হাসল। চায়ে চুমুক দিলে।

বিলাস বললে, সেই জন্যেই তো বলি, তোরা স্বপ্নবিলাসী—এ-সব প্র্যাক্টিকাল লাইন তোদের জন্যে নয়।

মোহমুক্তি হয়েছে অনেকক্ষণ আগেই। তবু একটুখানি রসিকতা করতে ইচ্ছে হল গৌতমের।

—না ভাই, স্বপ্ন-বিলাস আর নয়।—মুখের চেহারা শক্ত করে গৌতম বললে, কেরাণীগিরি করতে করতে সত্যিই মরে যাচ্ছি একেবারে। আমি তোর ফার্মেই যোগ দেব। পার্টনার করে নে।

—ঠাট্টা হচ্ছে বুঝি?—বিলাস ঠাট্টা করতে চেষ্টা করল।

—না ঠাট্টা নয়। আমি সত্যিই আর পারছি না। ভাবছি, চাকরিতে রিজাইন্ দিয়ে কাল থেকে তোরই ফার্মে কাজে লেগে যাব।

বিলাসের চোয়াল ঝুলে পড়ল হঠাৎ।

—বেশ-তো, বেশ-তো। তোকে যদি পার্টনার পাই—ও—আই উইল ফীল সো হ্যাপি। কিন্তু—বিলাস বিব্রতভাবে সিগারেটটাকে মিকি মাউস অ্যাশট্রের গর্তে গুঁজে দিলে: কিন্তু কথাটা কী জানিস? এই মাত্র মাসখানেক হল আমি একজন নতুন পার্টনার নিয়েছি—

ভালো বিস্কুটের সুরভিত ক্রীমের স্বাদে আরামে চোখ বুজে গৌতম বললে, আর একজনকে নিয়ে নে না। তোর তো মস্ত ফার্ম, আমার একটা জায়গা হবে না?

—ছ'মাস আগেও হত। কিন্তু জানিস তো ভাই, বিজ্‌নেস এত ডাল্‌—বিলাস ঢোক গিলল: আমি বলছিলুম, চাকরিটা তুই এখন না-ই বা ছাড়লি।

—সেকি রে!—গৌতম চোখ মেলল: আমি যে তোর ভরসায় এদিকে প্রায় সব ব্যবস্থা করে ফেলেছি।

—আই সী—আই সী!—বিলাস বললে, তা ছাড়া কয়েকটা স্পেকুলেশনেও প্রায় চল্লিশ-বেয়াল্লিশ হাজার টাকা লস হল। তুই আর ক'টা দিন বরং চাকরিটা কর—হঠাৎ যেন সে আত্মরক্ষার একটা উপায় খুঁজে পেল: একটু সুবিধে হলে আমি নিজেই তোকে চিঠি লিখব এখন।

শেষ বিস্কুটটা চিবিয়ে চায়ের পেয়ালায় শেষ চুমুক দিলে গৌতম। রুমাল দিয়ে মুখ মুছল ধীরে সুস্থে। পাশের টিপয় থেকে একটা সমুদ্রের কড়ি তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ তার কারুকার্য অনুধাবন করল। তারপর বললে, বেশ, ওই কথাই তবে রইল। একটা সুযোগ হলেই খবর দিস।

মনে মনে বিলাসের যে স্বস্তির নিশ্বাস পড়ল, সেটা বুঝতে দেরী হল না গৌতমের।

—নিশ্চয় দেব। তোকে যদি পার্টনার পাই—

গৌতম কথাটা থামিয়ে দিলেঃ সে তো জানিই।—উঠে দাঁড়িয়ে বললে, আচ্ছা ভাই, তবে আমি চলি।

বিলাস বললে, সো কুইক? ওয়েল, তোর যদি কাজ থাকে, তা হলে আমি আর তোকে আটকাতে চাই না। কিন্তু একেবারে ভুলে থাকিস্‌নি। আসিস মাঝে মাঝে, চিয়ারিয়ো।

—চিয়ারিয়ো।

গৌতম ধীরে ধীরে ট্রাম লাইনের দিকে এগিয়ে চলল। লেকের দিক থেকে হাওয়া আসছে। পাতা কাঁপছে ঝিরঝিরিয়ে। দু পাশের শান্ত-বিশ্রান্ত বাড়ীগুলোতে রেডিয়োর শব্দ—বাজনার আওয়াজ, টুকরো টুকরো কথার কাকলি। বৃষ্টির জল জমে-থাকা ছোট-বড় গর্তে জ্যোৎস্না আর ইলেক্‌ট্রিকের আলো।

কিন্তু এ পথ দুপুরের পার্ক স্ট্রীট নয়।

বিলাসের কাছে শ' পাঁচেক টাকা ধার চেয়ে দেখলে হত। দিত?

ঃ বিজনেস্‌ যে রকম 'ডাল' ভাই, কী আর বলব। তারপরে কয়েকটা স্পেকুলেশনেও প্রায় চল্লিশ হাজার টাকা 'লস্‌' হল—

গৌতম হাসল। জেমস্‌ জয়েসের ইণ্টেরিয়র মনোলগ্‌। এজরা পাউণ্ড, ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস, মার্ডার ইন দ্য ক্যাথিড্রাল, দিনকাল ভারী খারাপ, কী করব ভাই তোকে নিতে পারলে, চিয়ারিয়ো, বিলাস মজুমদার, তোরা কবি, একটা খোঁড়া কুকুর—মিকি স্পিলেন, বিজনেস্‌ যে রকম ডাল্‌—টালীগঞ্জ ডিপো—বিস্কুটগুলো চমৎকার, ট্রাম—

সামনে ট্রাম লাইন।

ট্রাম প্রায় এসেই পড়েছিল। পা-দানিতে লাফিয়ে উঠে গৌতম দেখল, ঠিক তক্ষুনি একটা মোটর বেরিয়ে গেল পাশ দিয়ে। আর

সেই গাড়ীতে যে বসে আছে, তাকে ছোট সাহেব ভৌমিক বলে মনে হল আচমকা।

সুমতি সেলাই করছিল। মুখ তুলে তাকালো।

কী বিশ্রী যে লাগল গৌতমের। সুমতির চওড়া হয়ে আসা করোটি-কপালের ওপর আলো পড়েছে, নিচে চোখ দুটোতে অন্ধকার। ঠিক কঙ্কালের দৃষ্টি।

—এত দেরী হল যে?

—সেই ফিল্ম কোম্পানির অফিসে গিয়েছিলুম।

—হল?

অন্ধকার চোখ দুটো জ্বলে উঠতে চাইল।

ঘামে-ভেজা শার্টটাকে ব্র্যাকেটে ঝুলিয়ে রাখতে রাখতে গৌতম বললে, কাল হবে বোধ হয়।

—বোধ হয়?—সুমতি হাসল। সিনিকের হাসি।

লুঙ্গির দিকে হাত বাড়াতে বাড়াতে গৌতম ভাবল: কেন এমনভাবে শুকিয়ে গেছে সুমতি? শরীর ভেঙেছে বলে মনটাকেও কেন ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছে? হাসে না, খুশি হয় না, বিশ্বাস করে না?

ঠিক এমনি সময় শিশু কণ্ঠের ডাক উঠল বাইরে।

—দু মুঠো ভাত দেবেন মা—রাণীমা গো—

এই—এই এরাই। গৌতমের মাথার মধ্যে যেন রক্ত ছুটে গেল একরাশ। টালীগঞ্জের সেই ভিখারী মেয়েটার মুখ মনের ওপর দিয়ে ঝলকে গেল। এদের জন্যেই। পৃথিবীতে হাসি থাকবে না, আনন্দ থাকবে না গান থাকবে না। এদের নিঃশ্বাসের অভিশাপেই পৃথিবীর বাতাস বিষাক্ত হয়ে গেছে, অতসী কাচের আলোয় যেমনভাবে কাগজ পুড়ে যায়, তেমনিভাবে এদের চোখের

দৃষ্টিতেই ফুলের রঙমাখানো নীল দিগন্ত পুড়ে কুঁকড়ে গিয়ে কণা কণা ছাই হয়ে ঝরে পড়ছে।

—বড় খিদে পেয়েছে রাণীমা—দু মুঠো ভাত দেবেন মা—

দড়াম করে জানলাটা টেনে খুলে বজ্র-গর্জন করল গৌতম।

—চ্যাঁচাচ্ছিস কেন কানের কাছে? হোটেল পেয়েছিস—না? সাতাশ টাকা চালের মণ—তোদের জন্যে কাঁড়ি-কাঁড়ি ভাত রেঁধে বসে আছে সবাই?

সুমতি পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

—আঃ, কেন মিথ্যে রাগারাগি করছ? সকালের খানিক এঁটো ভাত পড়ে আছে, দিয়ে দিই বরং। ও তো ফেলাই যাবে।

সকালের এঁটো ভাত না সুমতির মুখের ভাতের খানিকটা? জিজ্ঞাসা করতে গিয়েও করলনা গৌতম। রাগ করে চটিটা পায়ে গলিয়ে চটাস চটাস শব্দে এগিয়ে চলল কলঘরে।

দুই

[শুক্রবার : দুপুর—সন্ধ্যা—রাত্রি]

॥ ১ ॥

ঘড়ি পরতে গিয়ে পট্ করে কেটে গেল হাতের ব্যাণ্ড্।

গৌতম বিরস মুখে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সেদিকে। মাত্র দু মাস আগে আট টাকা দিয়ে কিনেছিল এভার ব্রাইট্ স্টীলের ব্যাণ্ডটা। দোকানদার বলেছিল, দু-তিন বছরে কিচ্ছু হবে না—চকচক করবে ঠিক। দেখে নেবেন।

চকচক হয়তো করবে, কিন্তু দুমাসের মধ্যে কেটে যাবে না একথা বলেনি। কেটে গেলেও চকচক করতে বাধা নেই।

জোচ্চোর! সবাই জোচ্চোর!

ব্যাণ্ডের কাটা টুকরোটাকে লাথি মেরে খাটের তলায় পাঠিয়ে দিলে গৌতম। পানের সঙ্গে চুণটা বেশি খেয়ে ফেলেছে—জিভ জ্বালা করছিল। অসীম বিরক্তিতে ঘড়িটাকে পাঞ্জাবীর পকেটে পুরে বেরিয়ে পড়ল ঘর থেকে।

সামনে মা দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—মঙ্গলবারে লোটনের পরীক্ষার ফী—

—মনে আছে, সবই মনে আছে আমার।

—তোরা যদি কাল-পরশু বেরিয়ে যাস, যদি খেয়াল না থাকে, তাই বলছিলুম।

গৌতম মা-র মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দেখল। ঠোঁটের একটা কোণা যেন একটু বাঁকা, চোখে অল্প একটু জ্বালা। কথাটার ভেতরে খোঁচা আছে। গৌতমের তিক্তভাবে বলতে ইচ্ছে হল,

পরীক্ষায় ফেল করেছে, সে ফী যখন জুগিয়েছি, তখন কম্পার্ট-মেণ্টালের ফীও জোগাতে পারব।

কিন্তু অফিস যাওয়ার সময় ওই একটি কথাতেই অগ্নিকাণ্ড ঘটতে পারে। হয়তো রাগ করে মা খাবেন না, সুমতিকেও উপোস দিতে হবে সারাদিন। গৌতম কথা বাড়ালো না। পকেট থেকে ব্যাণ্ড-ছেঁড়া ঘড়িটা বের করে সময় দেখল, তারপর রুদ্ধশ্বাসে বেরিয়ে পড়ল পথে।

আবার সেই ভীড়। ফুটবোর্ডের চক্রব্যূহ ভেদ করে বাসের একটা 'রড্' আঁকড়ে প্রশান্তিলাভ। ঘামে আর গরমে গাদাগাদি মানুষ—একতাল চটকানো খেজুরের উপমা মনে আসে।

বাসের কণ্ডাক্টার যোগসিদ্ধ পুরুষ। নির্বিকার, পরমহংস অবতার। এর মধ্যেও লোক ডাকছে। এবং কেবল যে ডাকছে তা-ই নয়, উঠিয়েও নিচ্ছে। কোথায় ওঠাচ্ছে একমাত্র সে-ই জানে।

ভীড়ের গুঁতোয় নিজের অজ্ঞাতেই সামনের দিকে এগিয়ে গেছে গৌতম। এবং শেষ পর্যন্ত যেখানে গুরু গোবিন্দ সিংহের রঙীন্ ছবির ওপরে ভুল বানানে লেখা আছে "ধুমপান নিশেধ"—সেইখানে গিয়ে ঠেকেছে পিঠটা। জায়গাটা বেশ নিরাপদ। এখন কাউপারের বালকপাঠ্য বহু-উদ্ধৃত কবিতায় সেল্‌কার্কীয় প্রশান্তি:
"My right there is none to dispute—"

পেছনে ইঞ্জিনের উত্তাপ। পোড়া গ্যাসোলিনের গন্ধ। ওই গন্ধ আর উত্তাপে গৌতম চকিত হয়ে উঠল। এগুলোর সঙ্গে একটা অনুষঙ্গ আছে তার। ছেলেবেলার দুঃস্মৃতি।

...মফঃস্বল শহরের বাজার। তার সামনে তিন-চারটে বাসে লোক ডাকছে।

: চন্দনঘাট—চন্দনঘাট। রাজবাড়ির রাসের মেলা, আসা-যাওয়া আট আনা।

চন্দনঘাট রাজবাড়িতে রাসের মেলার যাত্রী সংগ্রহ করবার প্রতিযোগিতা।

এদেরই একখানা বাসে একটি পরিবার উঠেছে সামনের আসনে। স্বামী, স্ত্রী, তাঁদের সতেরো আঠারো বছরের একটি বিবাহিতা মেয়ে—অল্পদিনের মধ্যেই সে মা হবে, আর ছুটি চার পাঁচ বছরের ছেলে।

যাস ছাড়তে দেরী দেখে পাছে তারা সামনের অন্য কোনো গাড়ীতে গিয়ে ওঠে, তাই সাবধানী ড্রাইভার চাবি দিয়ে দিয়েছে। আর এক টিন পেট্রোল এনে ঢালছে এঞ্জিনে।

মুখে তার জ্বলন্ত একটা বিড়ি ছিল। সেটা টপ করে পেট্রোলে পড়ল। তার পরের ঘটনাটা সংক্ষিপ্ত। সমস্ত বাসটা কয়েক মুহূর্তে পাঁচজন জীবন্ত মানুষের চিতায় পরিণত হল। চাবীবন্ধ বাসের ভেতর থেকে তাদের বীভৎস রান্না শোনা যেতে লাগল: বাঁচাও—বাঁচাও—

কিন্তু কে বাঁচাবে? বাঁচাবেই বা কেমন করে? বাসটা মশালের মতো জ্বলছে। ড্রাইভার চাবী খুলতে গিয়ে পারল না—তার হাত পুড়ে গেল। একদল নিরুপায় লোক দূরে দাঁড়িয়ে কেবল শুনতে লাগল আরো নিরুপায়দের মরণ-কান্না। কল নেই, ফায়ার বিগ্রেড্ নেই—কয়েক বালতি জল পড়তে না পড়তে বাষ্প হয়ে উড়ে গেল।

তারপর সারি সারি পাঁচটা পুড়ে কালো হয়ে যাওয়া মৃত-দেহ। সে এক বীভৎস দুঃস্বপ্ন। আর তার ভেতরে সব চাইতে বীভৎস একটি আধপোড়া নবজাতক—মা-র মৃত্যুযন্ত্রণার মধ্যে আগুনের প্রসারিত হাতে সে পৃথিবীতে মুক্তিলাভ করেছিল! ··

পোড়া গ্যাসের গন্ধ। উত্তাপ। গৌতম চোখ বন্ধ করে ফেলল। এই বাসেও যদি অমনি করে আগুন লাগে? অথবা লাগবারও

দরকার নেই। সবই তো মৃতদেহ—সে নিজেও কি ব্যতিক্রম? বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না, অথচ ভেতরটা সব পুড়ে গিয়ে কালো কদাকার কতগুলো মাংসপিণ্ড হয়ে গেছে।

'We are the hollow men!' সেই কলেজে পড়ার আমলের কবিতা। সেদিন গৌতমের ভালো লাগেনি কবিতাটাকে, সেদিন এই চোখ দিয়ে জীবনকে সে দেখতে শেখেনি। আজ বাসের এই ভীড়ের ভেতর, মা, সুমতি, ভৌমিক আর বিশু জোয়ার্দারের একটা বিমিশ্র অনুভূতিতে, খানিকটা আকার-আকৃতিহীন যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হতে মনে পড়ল:

"Shape without from, shade without colour"—

—ড্যালহাউসি—ড্যালহাউসি—

ষ্ট জর্ণিজ্ এণ্ড!

নামতে নামতে দেখা গেল, লাল-দীঘির মাথার ওপর নীলকান্তি আকাশ, ঘন সবুজ পাতার ওপর চূড়োর মতো ফিকে-বেগুনী ফুলের গুচ্ছ। 'নীল দিগন্তে ওই ফুলের আগুন লাগল—'

ভৌমিক সাহেব। রাস্তা পার হতে গিয়ে চিন্তিতভাবে গৌতম একবার নিজের একটা আঙুল কামড়ে ধরল: আজ ঠন্ঠনেতে একটা প্রণাম করে এলে হত। দশ বছরের ভেতরেও কাজটা করা হয়নি—দেবী প্রসন্ন হতেন নিশ্চয়ই।

ব্রজেন দস্তিদার দু'হাতের ভেতরে বিড়িটাকে গাঁজার কলকের মতো করে ধরে টান দিলে। ফলে প্রায় দেড় মিনিট এমনভাবে খকর খকর করে কাসল যে গৌতমের সন্দেহ হল এইবার লোকটার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে গলা দিয়ে বেরিয়ে আসবে।

—কেন যে অমন করে বিড়ি খাও ব্রজেনদা—!

চোখের জল আর মুখের দুপাশ মুছে ফেলে ব্রজেন দস্তিদার

হাঁপাতে লাগল : আরে, শরীরে যদি একটু জানান দিয়েই না গেল, তা হলে আর নেশা কিসের ? সাধুরা গাঁজায় দম দিয়ে বসে থাকে—দেখেছিস ?—(মধ্যে মধ্যে ব্রজেন উত্তেজিত হলে 'তুই' বলে) ওই দমের চোটে মাথা ফেটে যেতে চায়—কখনো কখনো চাঁদি ফুঁড়ে মহাপ্রাণীটিও ফুস্ করে উড়ে পালায়। তাতে কি ছাড়ে ? দেখিস্ নি, তার পরেই আবার মদ নিয়ে বসছে ? আরে—একেই তো বলে তপস্যা। নিজেকে যত বেশি কষ্ট দিবি —ততই চট্‌পট্ সিদ্ধিলাভ হবে। বিশ্বাস না হয় শাস্তর খুলে দেখিস, তোদের শ্রীভগবান শ্রীগীতাতেও সে-সব কথা বলেছেন।

—আপনি কিসের তপস্যা করছেন ব্রজেনদা ?—ভীরু গলায় অনিল মৈত্র জানতে চাইল।

—সে তুই কি বুঝবি—অর্বাচীন কোথাকার !—ব্রজেন ভ্রূকুটি করল : মুক্তির তপস্যা করছি।

—কিসের মুক্তি ?

—এই কেরাণীত্বের ভববন্ধন থেকে মুক্তি। নেড়ীকুত্তার মতো এমন করে টিঁকে থাকাকে বাঁচা বলে ? ছোঃ!

আবহাওয়াটা গম্ভীর হয়ে গেল। প্রাণপণে যেটাকে ভোলবার চেষ্টা—ব্রজেন দস্তিদার সেটাকে কেন যে এমন বীভৎস ভাবে মনে করিয়ে দেয়!

ব্রজেন আবার বললে, তোমাদের এই ইউনিয়ন। মাঝে মাঝে সভা-টভা করো, গতবার তো স্ট্রাইক নোটিশ দিয়ে ভয় দেখিয়ে কিছু আদায়ও করে নিলে। কিন্তু কী হল ? একমুঠো মাটি দিয়ে দীঘি ভরাতে চাও ?

গৌতম আস্তে আস্তে বললে, ইউনিয়ন তো যথাসাধ্য করছে।

—রেখে দাও তোমাদের ইউনিয়ন। পাঁচটা টাকা মাইনে বাড়ল কি বাড়ল না, 'বোনাস' পাওয়া যাবে কি যাবে না, কা'র

বে-আইনি ছাঁটাই তোমরা রুখেছ—এসবে কতটুকু কী আসে যায় হে। এই কেরাণীগিরি জিনিশটাই লোপ করে দিতে পারো না দুনিয়া থেকে? পিঠ খাড়া রেখে, সোজা বুক চিতিয়ে নিয়ে মানুষ যাতে বাঁচতে পারে—সে ব্যবস্থাটা করতে পারো না? বুঝি তাহলে।

অনিল মৈত্র বললে, সে তো আর একদিনে হবে না। সে হল বিপ্লব। তার জন্যে অনেকদিন ধরে তৈরী হতে হয়, অনেক আন্দোলন করতে হয়। একদিন তা-ও হবে—প্রায় মুখস্থের মতো অনিল মৈত্র বলে চলল, সেদিন দেশে মধ্যবিত্ত থাকবে না—শ্রেণী-সংগ্রাম থাকবে না, রাষ্ট্র লোপ পাবে—সেই ভবিষ্যতে—

—থামো ছোকরা, থামো।—নাক দিয়ে ঘোড়ার মত একটা আওয়াজ করল ব্রজেন দস্তিদার: খুব হয়েছে, আর কপিবুক আউড়ে কাজ নেই। সবাই ওই ভবিষ্যতের কথাই বলে। কিন্তু ভবিষ্যৎ নিয়ে আমি কি ধুয়ে খাব? যখন আমি থাকব না, তখন কী হবে না হবে তাতে আমার কী আসে যায়? আমাকে যা দেবার নিতে পারো এখুনি? একটা ছোট বাড়ী, আমার স্ত্রীর পরণের কাপড়, আমার ছেলেমেয়েদের শিক্ষা, আমাকে বুকটান করে চলবার মতো একটা কাজ আর হপ্তায় এক বোতল স্কচ্? পারো দিতে? যদি না পারো, তবে আর তোমাদের ওই তেঁতুলবিচির গল্প শুনিয়ো না।

ব্রজেন দস্তিদার বিশ্রীভাবে উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। গলা চড়ছে উঁচু পর্দায়।

—তোমাদের ভালো কথা শুনে শুনে কান পচে গেল। এদিকে আকাশফাটানো শ্লোগ্যান, ঝাণ্ডায় চারদিক অন্ধকার—ঘুষি পাকিয়ে আন্দোলন—শেষে মুঠো খুললে পাঁচ টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট! ছোঃ! ঘেন্না ধরে গেছে।

পাশের অ্যাকাউন্টস্ সেক্শনে আওয়াজটা পৌঁছেছে ততক্ষণে।

—কী নিয়ে এত চেঁচামেচি হচ্ছে—ও দস্তিদারদা?

ব্রজেন একটা মুখভঙ্গি করলে। নিজেকে খানিক ধাতস্থ করে নিয়ে উঁচু গলায় সাড়া দিলে: পরকীয়াতত্ত্ব।

—পরকীয়াতত্ত্ব!—পার্টিশনের ওপার থেকে শোনা গেল: আহা, বড় ভালো জিনিশ। চালিয়ে যান। আমরা কি এক-আধটু রস পেতে পারিনে?

—এসব ঘন হয়ে বলবার জিনিষ হে ব্রাদার। পাবলিক মীটিঙের মতো চেঁচিয়ে শোনানো নয়।

—তা বটে, তা বটে।

হেড ক্লার্ক আসছিলেন। সুতরাং আলোচনাটা ওইখানেই থামল। ব্রজেন দস্তিদার ড্রয়ার খুলে চেকিং পেন্সিল খুঁজতে লাগল, অনিল অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে ফাইলের পাতা উল্টে চলল, আর গৌতম একমনে একটা করেস্পণ্ডেস্ নকল করতে লেগে গেল।

হেড্ ক্লার্ক ব্রজেনের ডেস্কের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—ওটা ঠিক করে দিয়েছ ব্রজেন?

—এত সহজে কী করে হবে স্যার? আমাকে এখন হিমালয় পর্বত ঘাঁটতে হবে।—গজ্ গজ্ করে ব্রজেনের জবাব।

—দয়া করে একটু ঘাঁটো ভাই।—হেড ক্লার্ক সস্নেহে হাসলেন: আর মুখটা একটু কম চালাও।—ব্রজেনের পিঠে একবার গভীর মমতায় হাত বুলিয়ে দিয়ে প্রস্থান করলেন।

অনিল মৈত্র বললে, শুনিয়ে গেল ব্রজেনদা।

—বাগে পেলে আর কে না শোনায়? চিৎকারটা কানে গেছে বোধ হয়।—ব্রজেন নাক-মুখ সিঁটকে বললে, ঘুঘু। বাস্তুঘুঘু এক নম্বরের। ছোট সায়েবের বৃন্দে দূতী।

—বৃন্দে দূতী? মানে?—অনিল চোখ কপালে তুলল।

—মানে ?—আবার একটা বিড়ি ধরাতে গিয়ে কী মনে করে ব্রজেন দস্তিদার সেটাকে কানে গুঁজে ফেলল : বলেছি তো, এত তাড়াতাড়ি কি সব জানলে চলে ? ছুদিন দাঁড়াও, কচি দাঁতগুলো একটু শক্ত হোক, তার পরে জ্ঞানবৃক্ষের ফল চিবুতে চেষ্টা কোরো।

—কিন্তু—

ব্রজেন ভ্রূকুটি করল : কাজ করো, কাজ করো। আবার এসে পড়তে পারে। ঈস্, কবে যে ওর জন্যে আপিসে আমরা একটা শোকসভা করতে পারব !

নিঃশব্দে কাজ চলল খানিকক্ষণ। ব্রজেন দস্তিদার লেজারের পর লেজার চেক করে চলল, অনিল কিসের অঙ্ক কষতে লাগল, গৌতম করেস্‌পণ্ডেস্ নকল করার ফাঁকে ফাঁকে ভাবতে লাগল, কতক্ষণে ভৌমিক আসবে। ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে শান্ত ভালোমানুষ মহিলা টাইপিস্ট উমা সেনের মেশিনটা ছেদহীন শব্দ-তরঙ্গে অফিসটাকে ভরিয়ে রাখল।

এতদিন পরে যেন টাইপিস্ট মেয়েটির অস্তিত্ব সম্পর্কে আজ সচেতন হল গৌতম।

কলম তুলে কিছুক্ষণ সে তাকিয়ে রইল মেয়েটির দিকে। ছেলেমানুষ, বয়েস উনিশ-কুড়ির বেশি নয়। গায়ের রঙটা শ্যামলা —কেন যেন নতুন পাতার কথা মনে করিয়ে দেয়। মুখখানা সুকুমার, সমস্ত শরীরটাও যেন নতুন—কালিদাসের উপমায় 'উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং।' মেয়েটির চোখ ছুটি এর আগেও কয়েকবার দেখেছে গৌতম—মনে হয়েছে কালো জলের ওপর ছুলছে বনঝাউয়ের পাতা।

এই মেয়ে কেন আসে অফিসে চাকরি করতে ? এর আঙুল খেলবে সেতারের তারে তারে ; এর দৃষ্টি ছড়িয়ে থাকবে "দূর-দিগন্তে মাঠের পারে, সুনীল ছায়া গাছের সারে।" এ-কালের

যে-পথচারিণীরা বিদ্যুতের মতো খরদ্যুতি—এ তাদের দলের নয়; যৌবনে পা দিয়েই মুখে প্রৌঢ় অভিজ্ঞতার গাম্ভীর্য টেনে যারা স্কুলে-অফিসে চাকরী করে, এ তাদেরও কেউ নয়। এর জন্যে গান, এর আঙুলে সেতারের ঝঙ্কার আর ছবির রেখা—কোনো মৃত্যু-পরবর্তী প্রার্থনা-সভার মতো এক বিষণ্ণ সন্ধ্যার প্রেক্ষাপটে একে দেখেই তো রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন: "ঝিল্লী যেমন শালের বনে নিদ্রা-নীরব রাতে"—

মেয়েটি টাইপ করে চলেছে ক্লান্ত আঙুলে। কর্কশ শব্দ করে টাইপ-রাইটারের চাবিগুলো আরো কতগুলো কর্কশ অক্ষর এঁকে চলেছে। টু মেসার্স শার্পার অ্যাণ্ড শার্পার, ফিলাডেল্‌ফিয়া। বৈষয়িক স্থূল চিঠি—প্রত্যেকটা হরফে যেন বেনেতী মশলার গন্ধ। এখানে নয়—এখানে নয়। সেতারের তার সুরের ছোঁয়ায় কয়েকটা অগ্নিরেখায় পরিণত হয়ে যাক, শর্ষে ফুলের সোনালী ক্ষেত পার হয়ে দূরের পাহাড় আর শালবনের দিকে প্রজাপতির ঝাঁকের মতো ভেসে চলুক গান:

"নীল দিগন্তে মোর বেদনখানি লাগল,
অনেক কালের মনের কথা জাগল।
এল আমার হারিয়ে-যাওয়া কোন ফাগুনের পাগল হাওয়া—
বুঝি এই ফাগুনে—"

—হু—হুউম্।

ব্রজেন দস্তিদারের গলা-খাঁকারি। গৌতম চকিত হল।

—ওদিকে তাকিয়ে দেখছ কী? তোমারও কি শেষে চোখের দোষ হল নাকি হে?

পেছনে অনিল মৈত্রের চাপা হাসি।

ব্রজেন দস্তিদারকে এই মুহূর্তে ভারী আদিম, ভারী অশ্লীল মনে

হল গেতমের। দুঃখ আছে, অভিযোগের শেষ নেই—এমন অনৌক যন্ত্রণা আছে যা সূচিকাভরণের মতো তিলে তিলে শিরাস্নায়ুতে বিষ সঞ্চার করে। সে দুঃখ, সে যন্ত্রণার অভিব্যক্তি যত বীভৎসই হোক, মেনে নিতে পারি তাকে ; কিন্তু এই সিনিক দৃষ্টিভঙ্গিই অসহ্য বোধ হয়। এই কারণেই গৌতম কখনো কার্টুন ছবি পছন্দ করতে পারে না। আব একটু কেন সহজ হতে পারে না ব্রজেন? সাধারণ মানুষের মতো একটু মোহগ্রস্ত হতে জানে না? পাঁচকে একটুখানি বেঁকিয়ে দিয়ে প্যাঁচার কথা না বলে কেন কখনো-কখনো অনুভব করতে পারে না বসন্ত-পঞ্চমকে?

—লং সাইট খারাপ হবে গৌতম। মাইনাস্ চশমা নিতে হবে।

গৌতম ক্লান্তভাব হাসল, জবাব দিলে না।

কথাটা আর একটু গড়ালে ব্রজেন দস্তিদার কতদূর এগোতে পারে গৌতম তা জানে। এর পরে প্রাকৃত-ভাষায় যে অ্যানাটমির চর্চা শুরু হবে, তা কান পেতে শোনা শক্ত—শোনার প্রলোভন জয় করা আরো শক্ত। সমস্ত চিন্তাই বিস্বাদ হয়ে গেল। ব্রজেন ঠিকই বলেছে, এই কেরাণীদের লুপ্তি ঘটানো দরকার। অন্তত ব্রজেন দস্তিদারের পরিণতিই তার সপক্ষে যথেষ্ট কারণ।

কিন্তু গৌতমের কাছ থেকে বিশেষ সাড়াশব্দ না পেয়ে ব্রজেনই জের টানল না।

—ভালো কথা, তোমার ছুটি কী হল হে?

বিরক্ত মন আরো কটু হয়ে গেল গৌতমের। দু হাত তুলে ভঙ্গি করল নিরুপায়ের।

—ত্রিশঙ্কু।

—বাস্তুঘুঘু কী বলে?

অর্থাৎ হেড ক্লার্ক। ভদ্রলোকের প্রায় শত নাম জপ করতে

আরম্ভ করেছে ব্রজেন। পুরোনো ফাইল ঘাঁটতে হচ্ছে বলে ক্ষেপে উঠেছে আরো।

—কী আর বলবে?—কলমটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে খানিক কালি লাগল গৌতমের পাঞ্জাবীর হাতায়ঃ বলছে আমি তো খুব স্ট্রঙ্গলি রেকমেণ্ড করে দিয়েছি। এখন ভৌমিক সাহেব—

—ওঃ, ছাট্ এপ্ অফ্ এ ম্যান—

আরো কী বলতে যাচ্ছিল ব্রজেন, কিন্তু ঠিক সেই সময়েই ছোট সাহেবের কাছ থেকে বেয়ারা এল। গৌতমকে বললে, সাহেব আপনাকে ডেকেছেন।

ছোট সাহেব বললেন, আরে আসুন, আসুন,—বসুন।

—আমরা স্যার সাবর্ডিনেট্—গৌতম হাত কচলাতে লাগল।

—ও প্লীজ টেক্ ইট্ ঈজি—ভৌমিক বললেন, বসুন।

বসতেই হল।

—আমি জানতুম না গৌতমবাবু—ছোট সাহেবের গলা কেমন সশ্রদ্ধ হয়ে উঠলঃ আপনি একজন 'অথর'। রিয়্যালি—ওই যে বাংলায় বলে না, যে প্রদীপের নিচেই অন্ধকার? আমাদের দশাও হচ্ছে তাই।

এবার গৌতমের আশ্চর্য হওয়ার পালা। এই অফিসেই মাত্র দু-একজন জানে এককালে সে গল্প-কবিতা লিখত। তারাও এতদিনে সে-কথা নিশ্চয় ভুলে গেছে। কিন্তু ভৌমিক সাহেব আবিষ্কার করলেন কী করে?

—ওসব কিছু না স্যার—আপ্যায়িত হয়েও গৌতম খুশি হতে পারল নাঃ আজকাল ছেড়ে দিয়েছি। তা ছাড়া আমাদের আবার লেখা।

—ও, নো-নো! আপনি বিনয় করছেন।—ভৌমিক বললেন, ইউ আর এ বিগ্‌ অথর। আপনার কী একটা গল্প ছবিও হচ্ছে শুনতে পেলুম।

গৌতম আকাশ থেকে পড়ল।

—আপনি কেমন করে জানলেন স্যার?

মিটি মিটি হাসলেন ভৌমিক।

—বাতাসে কান পাতা আছে মশাই, সব জানতে পারি।

ভৌমিকের রহস্যময় হাসির দিকে তাকিয়ে বেকুবের মতো কিছুক্ষণ বসে রইল গৌতম। ঢোক গিলল বারদুই।

—সত্যি স্যার—আপনি—

ছোট সাহেব এবার সশব্দে হেসে উঠলেন। সন্ত্রস্ত গৌতমের কপালে ঘাম দেখা দিলে।

—এই যাঃ—আপনি নার্ভাস্‌ হয়ে যাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছি। হাতের পাইপটাকে নিয়ে খেলা করতে করতে ভৌমিক বললেন, আমি সাহার কাছ থেকে শুনলুম।

—সাহা?

—হ্যাঁ—হ্যাঁ—পি, এল সাহা, স্টীল মার্চেণ্ট। স্টারলিট্‌ পিকচার্স বলে তার নাকি একটা কোম্পানি আছে। হি ইজ এ 'চাম' অফ মাইন। সন্ধ্যেবেলা আমরা একই ক্লাবে—একবার থেমে কী যেন সামলে নিয়ে বললেন, একই ক্লাবে আমরা আড্ডা দিই। সে-ই বলছিল। তা আমি বললুম, হাউ'জ্‌ ইট্‌? আমার স্টাফ্‌, আমি জানিনে? সাহা বললে, কাম অন্‌—বাজী রাখো। রিয়্যালি গৌতমবাবু—আপনার আমাকে বলা উচিত ছিল।

সে যে সিনেমার জন্যে গল্প বিক্রী করছে এ-কথাটা ভৌমিককে না বলা নিশ্চয় অপরাধ হয়েছে। গৌতম হেঁ হেঁ করে হাসল। রহস্যটা তার কাছে পরিষ্কার হল এতক্ষণে।

পাইপ ধরাতে ধরাতে এবার প্রসন্ন মুখে ভৌমিক সাহেব গৌতমের মুখের দিকে তাকালেন : তা হলে আর ভাবনা কি মশাই, আপনি তো বড়লোক হয়ে গেলেন!

কতগুলো কাগজপত্র নিয়ে ঢুকলেন হেড ক্লার্ক। গৌতমকে চেম্বারে বসে থাকতে দেখে তাঁর কপালে মেঘ ঘনিয়ে এল, অস্বস্তিতে নড়ে উঠল গৌতম।

—ওয়েল মিস্টার ব্যানার্জী?

—এই বিলগুলো একটু দেখে দিতে হবে স্যার।

—রেখে যান—পরে হবে।

আড়চোখে একবার গৌতমের দিকে তাকিয়ে হেড ক্লার্ক বললেন, একটু তাড়াতাড়ি ছিল স্যার—

ভৌমিক বিরক্ত হয়ে বললে, বললুম তো, একটু পরে। কাম আফটার ফিফ্‌টিন মিনিট্‌স্। এখন একটু ব্যস্ত আছি—

—ওঃ!

এবার আর হেড্‌ ক্লার্ক আত্মগোপন করলেন না। গৌতমের মুখের ওপর সোজাসুজি এক মুঠো সন্দেহ আর বিরক্তি বর্ষণ করে বেরিয়ে গেলেন।

গৌতম কুণ্ঠিত হয়ে বললে, আপনার হাতের কাজটা শেষ হয়ে যাক স্যার। আমি পরেই আসব বরং।

—না, না, বসুন।—পাইপটা একবার ঝেড়ে নিয়ে ভৌমিক বললেন, মিস্টার ব্যানার্জীর কথা ছেড়ে দিন—হি ইজ ওভার-জেলাস। যেটা সাতদিন পরে হলে ক্ষতি নেই, তার জন্যে এখুনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠেন, আর যেটা এক্ষুনি দরকার, সেটা করতে ওঁর এক মাস লাগে। তা যা বলছিলুম, সিনেমায় গল্প বিক্রী হচ্ছে, আপনি তো এখন বড়লোক হয়ে যাবেন।

—আমাদের সে সব আশা নেই স্যার।

—হোয়াই নট্? কেন নেই? গল্পের জন্যে কত টাকা পাবেন? হাজার দশেক?

—দশ হাজার! গৌতম খাবি খেল: সাতশো এক টাকা দেবেন ওঁরা—কথা হয়েছে।

—সাতশো এক!—ভৌমিক সাহেবের চোখ গোল হয়ে উঠল: সাতশো? আর ইউ শিয়োর? সাত হাজার নয়?

—না স্যার, সাতশো।

—হোয়াট!—ভৌমিক বললেন, ছাট্স্ অ-ফুল। আই মাস্ট্ হ্যাভ্ এ টক উইথ্ ছাট্ রাইটার সাহা। বেচবেন না, কখনো বেচবেন না। রিফিউজ করুন।

রিফিউজ! গৌতম মাথা নিচু করল।

—এত পুয়োর মানি? সিনেমার গল্পের জন্যে এত কম দেয়?

গৌতমের একবার মনে হল, ভৌমিক অভিনয় করছেন।

—অথচ, কন্টিনেন্টে, অ্যামেরিকায়—সিনেমার রাইটারেরা তো রেগুলার মাল্টি-মিলিয়োনীয়ার। ইংল্যাণ্ডে আমি যখন পড়তুম, তখন ওখানে আমার এক বন্ধু ছিল—সে এইসব করত। তার তো দেখেছি অনেক টাকা।

গৌতম জিজ্ঞাসু চোখ তুলল।

—আপনিও বোধ হয় তার নাম শুনেছেন। হিল্টন। ইয়েস—আই রিমেম্বার হিজ নেম—জেম্স্ হিল্টন।

—জেম্স হিল্টন। ইংল্যাণ্ডে?—গৌতম বললে, আমি তো জানতুম, হিল্টন আমেরিকার—

—হ্যাঁ, হ্যাঁ আমেরিকায়।—ভৌমিক একবার থামলেন: আজকাল সে অ্যামেরিকাতেই থাকে বটে। আমি ছ'মাস আগেও হলিউড্ থেকে তার একটা চিঠি পেয়েছিলুম। ইণ্ডিয়া নিয়ে কী

গল্প লিখবে—আমার কাছে ইন্‌ফর্মেশন চেয়েছিল। হি ইজ এ নাইস ফেলো! আমাকে এত ভালোবাসে।

কী একটা বলতে গিয়েও মুখ বন্ধ করে ফেলল গৌতম। এর পরে আর কথা বাড়াবার কোনো অর্থ হয় না। ছ'মাসের অনেক বেশি আগে জেম্‌স্ হিল্‌টন মারা গেছেন—এখন একমাত্র পরলোক থেকে ছাড়া তাঁর চিঠি আসা অসম্ভব।

ভৌমিক বললেন, হিল্‌টন ইজ এ ভেরি গুড্ চ্যাপ। ও যখন র‍্যাণ্ডম্ হারভেস্ট বইটা লেখে তখন আমার সাজেশন নিয়েছিল। গল্পের শেষটা আমিই ওকে বলে দিয়েছিলুম—

খানিকটা আত্মপ্রসাদের হাসি হেসে বললেন, জানেন, আমারও অনেক আইডিয়া আছে।

—তাই নাকি স্যার?

ভৌমিক হঠাৎ গৌতমের দিকে ঝুঁকে পড়লেনঃ আমিও আপনাকে অনেক ভালো ভালো প্লট্ দিতে পারি। বুঝলেন, আমার নিজের লাইফটাই একটা ড্রামা। ইচ্ছে করলে তা নিয়ে আপনারা এনি নাম্বার স্টোরি তৈরি করতে পারেন। আই উইল টেল্ ইউ অ্যাবাউট এ 'গ্যাল্' ইন ডেল্‌লি—

হেড ক্লার্কের বেয়ারা এসে দাঁড়াল।

—স্যার, বড়বাবু বললেন, বিলগুলো—

—আঃ, নুইসেন্স।—বিরক্ত মুখে ছোট সাহেব বললেন, এরা আর তিষ্ঠোতে দেবেনা দেখছি।

গৌতম উঠে দাঁড়াল।

—তাহলে স্যার আমি—

—আচ্ছা আসুন।

এক মুহূর্তের দ্বিধা। ছোটসাহেব কাগজপত্রে মন দিয়েছেন।

—স্যার, আমার সেই ছুটিটা—

—ওঃ, ইয়েস, ইয়েস! সেইটে বলবার জন্যেই ডেকেছিলুম। দেখুন, ওটা বোধ হয় আসছে মাসের আগে আর হবে না।

অসহ্য হিংসায় মাথায় খুন চড়ে গেল গৌতমের। ইচ্ছে করল, টেবিল থেকে কাচের একটা পেপারওয়েট তুলে নিয়ে ছুড়ে মারে ভৌমিকের মাথায়। নিরুপায় ক্ষোভে গলার কাছে একটা শিরা থরথরিয়ে কাঁপতে লাগল কিছুক্ষণ।

—আই অ্যাম সরি! আই অ্যাম রিয়্যালি সরি।

—কিন্তু স্যার, আমি যে এদিকে সব ব্যবস্থা—ক্রোধটা কান্নার মতো বেরিয়ে এল গলা দিয়ে।

ভৌমিক আস্তে আস্তে মাথা নাড়লেন, বুঝতে তো পারছি সবই। কিন্তু আমাকেও তো অফিস ম্যানেজ করতে হবে। এনিওয়ে, আমি আরো একবার চেষ্টা করে দেখব। কাম টু-মরো।

কাম টু-মরো! কাগজ চাপা ছুড়ে মারা নয়—ইচ্ছে হল, ভৌমিককে তুলে জানলা দিয়ে নিচের ফুটপাথে ফেলে দেয়। কিন্তু গৌতম কিছুই করল না। অভ্যস্ত দীনতায় নমস্কার করে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

হুম্ হুম্ করে নিজের ডেস্কে এসে বসতেই দস্তিদার জিজ্ঞেস করলে, কী হল ?

গৌতম জবাব দিল না।

পেছনে কাজের ফাঁকে ফাঁকে অনিল মৈত্র গুন গুন করে চলেছে। রবীন্দ্র-সঙ্গীত : 'গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ'—

মুখ ফিরিয়ে হঠাৎ বিশ্রীভাবে চেঁচিয়ে উঠল গৌতম : কাজের সময় অমন ভাবে গান করছ কেন ? আমাদের অসুবিধে হয়।

অনিল মৈত্র ভয়ানকভাবে চমকে উঠল, শঙ্কিত নির্বোধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল গৌতমের দিকে। আর হা-হা করে হেসে উঠল ব্রজেন দস্তিদার।

—মন আর কত খারাপ করবি গৌতম? পকেটে যদি কিছু থাকে, সন্ধ্যেবেলা এক পেগ হোয়াইট-লেবেল স্কচ্ ম্যানেজ করে নে, সব ঠিক হয়ে যাবে।

॥ ২ ॥

—আসুন, আসুন—ব'লে বরেন সাঁতরা পাঁচশো পঞ্চান্নর টিন এগিয়ে দিলেন।

—মাপ করবেন, আমি খাই না।

—খুব ভালো মশাই, খুব ভালো। বেঁচে গেছেন—বলেই নিজে একটা সিগারেট ধরালেন তৎক্ষণাৎ।

চুপ করে বসে রইল গৌতম। কিছুক্ষণ।

—বরেনবাবু, আজকে কি ওটা হবে?

—হবে তো আশা করি। সেই রকমই তো কথা আছে।

আশা করি। সন্দেহের একটা ঠাণ্ডা ছোঁয়া এসে মন কুঁকড়ে দিলে।

—মিস্টার সাহা আসবেন না?

—অফ্ কোর্স, আসবেন বই কি। তবে একটু দেরী হতে পারে। হয়তো সাতটা-সাড়ে সাতটা বাজবে। কয়েকটা কাজ সেরে আসবেন বলেছেন। খুব তাড়া আছে নাকি আপনার?

গৌতম মাথা নাড়ল: না।

তাড়া থাকলেও উপায় নেই। একটা হেস্তনেস্ত করেই যেতে হবে আজ।

—চা আনাই?

—ধন্যবাদ, দরকার নেই। এখুনি খেয়ে আসছি।

মিথ্যে কথা, গৌতম চা খেয়ে আসেনি। হয়তো এখন এক পেয়ালা চা পেলে ভালোই হত। কিন্তু ভৌমিক সাহেব তার সারা মনটাকেই কদর্য করে দিয়েছে, পিত্তি ওঠবার মতো একটা বীভৎস আস্বাদ জড়িয়ে আছে মুখে।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটল। মোটরের হর্ণ বাইরে। নাকতলার বাসের কর্কশ চলনধ্বনি। মাথার ওপর পাখার শাঁই শাঁই। কোথায় যেন একটি মেয়ে উঁচু গলায় লহরে লহরে হেসে উঠেছে। এই অপরূপ স্বর্গলোকের অপ্সরী কেউ। কী চিৎকার করে হাসতে পারে এখানকার মেয়েরা। সামনে থাকলে গৌতম হাত চাপা দিয়ে ধরত ওর মুখে।

গৌতম আস্তে আস্তে বললে, মিস্টার জোয়ার্দার নেই ?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এসেছেন বই কি। ফ্লোরে রয়েছেন, শুটিং করছেন।

—ও:।

সাঁতরা জিজ্ঞাসা করলেন, শুটিং দেখেছেন কখনো ?

—না।

—দেখবেন ? চলুন না। মিস্টার সাহা অফিসে এলে আমাদের খবর দেবে এখন। এখানে এমন ভাবে বসে না থেকে ফ্লোরে গেলে সময়টা কাটবে ভালো।—সাঁতরা হাসলেন : তা ছাড়া নতুন অভিজ্ঞতাও হবে আপনার।

শরীরে মনে কোথাও কোনো উৎসাহ নেই ; কোনো কিছুই সহজ হয়ে আসছে না। আজ দুপুরবেলা যদি ভৌমিক সাহেব অমন করে মাথার ভেতর আগুন জ্বালিয়ে না দিত, যদি এমন ত্রিশঙ্কু অনিশ্চয়তা তাকে চাবুক না মারত, যে অবস্থায় পৌঁছুলে নরঘাতক হওয়া উচিত, যদি প্রায় তার সীমান্তে এসে না পৌঁছুত গৌতম—

—চলুন—

সাঁতরা উঠলেন। গৌতমকেও উঠতে হল। আর তখনই মনে পড়ল, সাহা ভৌমিকের বন্ধু।

ঠিক এক সূতোয় গাঁথা। একই চক্রান্তের অংশীদার দুজন।

লাল ধূলোয় ভরা দীর্ঘ উঠোন পেরিয়ে রেল স্টেশনের গুদামের মতো একটা ঘর। মোটা মোটা গোটাকয়েক রবারের কেব্‌ল বেরিয়ে এসেছে তার ভেতর থেকে। সামনেই একটা মোটর ভ্যান—তার ভেতরে দুজন লোক রেডিয়ো সেটের মতো কী একটা নিয়ে নাড়াচাড়া করছে।

সাঁতরা বললেন, সাউণ্ড্‌ ট্রাক্‌।

—অঃ।

—এতেই সাউণ্ড রেকর্ডিং হয়।

—অঃ।

ঘরের ভেতরে ঢুকতেই একবারের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল গৌতম। ধূলো, কাঁচা রঙ আব সিগাবেটের ধোঁয়ার একটা মিশ্র তীব্র গন্ধ জমাট বেঁধে আছে। পায়ের তলায় সরু মোটা অসংখ্য তার। ওপরে, নীচে, আশেপাশে, সার্চ লাইটের মতো কতগুলো আলো। তাদের একটা থেকে আগুনের মতো খানিক উদ্ভাস গিয়ে পড়েছে একটুকরো চালাঘরেব ওপর। কাঠ আর কাপড় দিয়ে তৈরী মাটির দাওয়া, সেখানে ডুরে শাড়ী পরে গালে হাত দিয়ে বসে আছেন স্বনামধন্যা নায়িকা শ্রীমতী দেবী। তাঁর পায়ের কাছে উবু হয়ে বসে একজন একটা বড় খাতা থেকে কী যেন পড়ে শোনাচ্ছে। বিজন একটা টেবিলে বসে একমনে লিখে চলেছে—তার ঠোঁটের কোনে পুড়ছে নিজাম্‌স্‌ ব্র্যাণ্ড।

শ্রীমতী দেবীর মাথার ওপর মাইক্রোফোন। সামনে প্রতীক্ষমান ক্যামেরা। চারদিকে লোকজনের ব্যতিব্যস্ত আনা-গোনা। একটা টুলের ওপর একখানা পা তুলে দিয়ে বিশু

জোয়ার্দার তাকিয়ে আছেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। ওদিকে প্রকাণ্ড এক প্রপেলার ঘুরছে—তা থেকে ঝড়ের মতো হাওয়া এসে বিশু জোয়ার্দারের চুলগুলোকে উড়িয়ে দিচ্ছে।

—অল্ লাইট্স্।—জোয়ার্দারের একটা তীক্ষ্ণ চিৎকার।

সঙ্গে সঙ্গে খট্ খট্ করে সুইচ্ বোর্ডের আওয়াজ। আর উর্ধ্বে অধে দক্ষিণে বামে যেখানে যতগুলো আলো ছিল, সব এক সঙ্গে জ্বলে উঠলো।

—ফ্যানস্ অফ্।

আবার সুইচের আওয়াজ। দুটো প্রপেলার থেমে এলো আস্তে আস্তে।

সাঁতরা গৌতমকে একটা চেয়ারে বসিয়ে বসিয়ে নিজে পাশে বসে পড়লেন। চুপিচুপি বললেন, দেখুন, টেক্ হচ্ছে!

লেখা বন্ধ করে উঠেছে বিজন। নিজাম্স্ ব্র্যাণ্ড পায়ের তলায় পিষে কালো কাঠের তৈরী পুরোনো পুঁথির মতো কী একটা এনে এইবার শ্রীমতী দেবীর মুখের কাছে ধরে দাঁড়িয়েছে। চুলগুলো এলো করে গালে হাত দিয়ে শ্রীমতী এমন ভঙ্গিতে বসে আছেন যেন পৃথিবীর যত দুঃখ আর দুর্ভাবনা তাঁরই মাথার ওপর।

—স্টার্ট ক্যামেরা—আবার বিশু জোয়ার্দারের চিৎকার।

—রানিং—

কির্কির্ করে আওয়াজ সুরু হল ক্যামেরার।

—স্টার্ট সাউণ্ড।—এবার বিজনের আর্তনাদ।

—ইয়েস্—বহুদূর থেকে ভেসে আসা প্রত্যুত্তর।

কালো কাঠের পুঁথিটার গায়ে খড়ি দিয়ে যেন কী সব লেখা। সেইটেতে খট্ করে একটা আওয়াজ করে বিজন বললে, বাসনা, সিন থার্টি, শট্ টু, টেক ওয়ান—তারপরেই গুঁড়ি মেরে সে এক পাশে সরে এল। বিচিত্র এই জগতের প্রায় অলৌকিক পরিবেশে

কিছুক্ষণের জন্যে নিজেকে ভুলে গেল গৌতম ; ভুলে গেল একরাশ অনিশ্চয়তার যন্ত্রণা, এক ঝলক উচ্ছ্বসিত বিরক্তি আর শিরাশিথিল করা খানিক অবসাদ তাকে দীর্ণ করছে—নিষ্পিষ্ট করে দিচ্ছে। আশ্চর্য হয়ে দেখতে পেলো, দুফোঁটা জল চিকচিক করছে শ্রীমতীর চোখের কোণায়। কী করে কেঁদে ফেলল এত সহজে ? পরে জেনেছিল ওটা নকল চোখের জল—গ্লিসারিন।

বৌদ্ধ-সন্ন্যাসীদের মতো হলদে কাপড় পরা একজন নামকরা সিনেমার ভিলেন একপাশ থেকে এগিয়ে এলো শ্রীমতীর দিকে।

ক্যামেরার ট্রলি একটু একটু করে পেছনে সরতে লাগল। কতগুলো খড়ির দাগ অনুসরণ করে।

ভিলেন বললে, সেবা !

শ্রীমতী চমকে মুখ তুলে তাকালো : আপনি আবার কেন এলেন মৃন্ময়বাবু ? কী চান ?

মৃন্ময় বাংলা ফিল্মে বহুপরিচিত ভিলোনোচিত হাসি হাসল : তুমি মিথ্যেই অপেক্ষা করে আছ সেবা। সুধীর আর ফিরবে না। আমার প্রস্তাবে তুমি রাজী হও। তোমায় দেড়শো টাকা করে মাইনে দেব—

—দেড় হাজার টাকা দিলেও না !—শ্রীমতী অর্থাৎ সেবা উঠে দাঁড়ালো। দু চোখে আগুন ঝরিয়ে বললে, আপনি কি মনে করেন যে টাকা দিয়েই সব কেনা যায় ? এ আপনার বিলেত নয় মৃন্ময় বাবু। আমি বাংলা দেশের নারী—আমার শরীরে সীতা-সাবিত্রীর রক্ত বইছে। আপনি এখুনি এখান থেকে বেরিয়ে যান মৃন্ময়বাবু—

মৃন্ময় দু পা পিছিয়ে গেল। তারপর আদর্শ ভিলেনের রীতিতে 'শ্রাগ' করে, ঠোঁট বাঁকিয়ে, এক চোখ বুজে চাপা গলায় বললে, আমাকে বার করে দিচ্ছ বাড়ী থেকে ? এখনও তুমি সুধীরের আশা করো সেবা ? হাঃ হাঃ হাঃ —

খামোকা অদ্ভুত ভঙ্গিতে খানিকটা হেসে মৃন্ময় বললে, ওয়েল-ওয়েল—অল্‌রাইট। তবে একথাও তুমি মনে রেখো সেবা—হঠাৎ অপ্রস্তুত গৌতমকে রীতিমতো চমকে দিয়ে, পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা রিভলভার দেখিয়ে বললে, My pistol never tells a lie—হাঃ হাঃ হাঃ—

তার পরেই নাটকীয় প্রস্থান —

গৌতমের কেমন বিষম লাগল। রিভলভারকে পিস্তল বলল কেন? দুটো কি এক?

—ও, কে—কাট্‌।—বিশু জোয়ার্দারের চিৎকার: সাউণ্ড, হাউ'জ ইট্‌?

—ও, কে, ও, কে।

—অফ্‌ লাইটস্‌। ফ্যানস্‌।

শ্রীমতী দেবী দাওয়া থেকে উঠে টুক করে কোথায় চলে গেলেন। বিখ্যাত ভিলেন ভদ্রলোক এসে বিশু জোয়ার্দারের ঘাড়ে একটা থাবড়া দিলেন: একটা সিগরেট ঝাড় মাইরি, পেট কেঁপে উঠছে!

গৌতম কান পেতে টুকরো টুকরো দুর্বোধ্য কথা শুনতে লাগল, দেখতে লাগল চারদিকের বিচিত্র চঞ্চলতা।

বরেন সাঁতরা বললেন, শটটা কেমন লাগল গৌতমবাবু?

—অ্যাঁ?—যেন ঘুমের ঘোর থেকে জেগে উঠল গৌতম।

—কেমন লাগল শট্‌টা? দেখলেন তো—এত বড় পিস্‌টা কী চমৎকার হয়ে গেল?

—বেশ হল। কিন্তু রিভলভার দেখিয়ে ওই যে পিস্তল বললে, ওটা—

—অত ডিটেল্‌স্‌ পিপল বোঝে না। আমরা তো মশাই আমগাছের পাতায় কাগজের স্থলপদ্ম লাগিয়ে তাকে চন্দ্রমল্লিকা

বলে চালিয়ে দিই, কিন্তু কেউ কি তা নিয়ে মাথা ঘামায়? তা ছাড়া ড্রামায় যদি ইমোশান থাকে—বুঝলেন না? তা হলে কি আর তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কেউ মাথা ঘামায়? ভেসে যায়—স্রেফ ভেসে যায়।

তাই। ভেসে যায়ই বটে। গৌতমের মনে পড়ল। কিছুদিন আগে শরৎচন্দ্রের গল্পের একটি হিন্দি চিত্ররূপ দেখেছিল সে। তাতে কিন্তু বাঙালী পল্লীবধূর ম্যানিকিয়োরকরা আঙুল তার দৃষ্টি এড়ায়নি।

বিশু জোয়ার্দার এগিয়ে এলেন।

—মিস্টার সান্যাল যে! নমস্কার।

—নমস্কার।

একপাশ থেকে একটা ইজিচেয়ার টেনে এনে তাতে গা এলিয়ে দিলেন বিশু জোয়ার্দার।

—কতক্ষণ এসেছেন?

—প্রায় আধঘণ্টা হল।

—শুটিং দেখলেন? কেমন লাগল?

গৌতম ক্লান্তভাবে হাসল।

—বেশ ভালোই। তবে—

এবারে বরেন সাঁতরা বললেন, উনি বলছিলেন, রিভলভার দেখিয়ে মৃন্ময় বলছিল My pistol, এই জন্যে ওঁর একটু খট্‌কা লেগেছে।

বিশু জোয়ার্দার উঁচু দরের হাসি হাসলেন: ওতে কিছু আসে যায় না। আসল পয়েণ্ট হচ্ছে ড্রামা, সেটা কেমন লাগল বলুন।

—গল্পটা না জানলে—

জোয়ার্দার মাথা নাড়লেন, তা বটে। আপনাকে সিচুয়েশনটা একটু বলি। মানে সুধীর হচ্ছে গ্রামের একজন আদর্শবাদী

তরুণ। অত্যাচারী জমিদারের চক্রান্তে তাকে জেলে যেতে হয়েছে। সেবা গরীবের মেয়ে, তার বাবা অন্ধ, মা নেই, সুধীরকে সে ভালোবাসে। মৃন্ময় হচ্ছে জমিদারের শালা, বিলেত-ফেরত, এই গ্রামে সে একটা কাপড়ের কল তৈরী করেছে। সে সেবাকে সেক্রেটারী করতে চায়—সেই সঙ্গে অন্য মতলবও আছে। বুঝলেন ব্যাপারটা ?

গৌতম কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেলো।

—ঠিক বুঝতে পারলুম না। বাংলাদেশের যে কোনো জায়গাতেই হুম্ করে কি একটা মিল তৈরী করা যায় ? র মেটিরিয়াল—লেবার—ট্রান্সপোর্ট এ সব নানা সমস্যা আছে। তা ছাড়া বিলেত-ফেরত একটা লোক কি অমন কথায় কথায় ক্লাউনের মতো ব্যবহার করে ? একটি মেয়েকে ভয় দেখানোর জন্যে সে একটা রিভলভারই বা বের করবে কেন ? আর দেশে কি শিক্ষিতা মেয়ের এতই অভাব যে একটা পাড়াগাঁয়ের অশিক্ষিত মেয়েকে সেক্রেটারী—

বরেন সাঁতরা বললেন, সুধীর ওকে লেখাপড়া শিখিয়েছে বাড়ীতে।

—এত শিখিয়েছে যে একটা মিল মালিকের সেক্রেটারী—গৌতম দ্বিধাভরে থামল।

—সিনেমায় ওতে আটকায় না।—জোয়ার্দার গম্ভীর হয়ে রায় দিলেন : অত ভেবে কি আর কেউ ছবি দেখে ? আর রিভলভারের কথা বলছেন ? সেদিনই তো মশাই একটা হিট ছবি হয়েছে, তাতে নার্সিং হোমে এক ডাক্তার ধাঁ করে একটা রিভলভার বের করে দেখালে। পকেটে রিভলভার নিয়ে কোনো ডাক্তার পেশেণ্টকে ডেলিভারি করাতে যায়—এ কথা জন্মে শুনেছেন ? কই, পাবলিক তো আপত্তি করেনি।

গৌতম চিন্তিত হয়ে বলল, হুঁ। কিন্তু ওই যে নায়িকা বললেন, আমি বাংলা দেশের মেয়ে—আমার শরীরে সীতা-সাবিত্রীর রক্ত— তা শুনতে ভালোই লাগল, কিন্তু সীতা সাবিত্রী কি বাঙালী ছিলেন?

—আহা, আর্যললনা তো ছিলেন।—বরেন সাঁতরা বিরক্ত হলেন: আপনাদের রাইটারদের ওই এক দোষ মশাই, সব জিনিশেই আপনারা খুঁত ধরেন। একি পরীক্ষার পরীক্ষার খাতা যে একটু ভুল হলেই নম্বর কাটা যাবে? লোককে আনন্দ দেওয়াই হল আসল কথা। আর ড্রামা যদি স্ট্রং হয়—তবে আর আটকায় কে!

—লেখকেরাই গল্প এ-ভাবে লিখে দেন সিনেমার জন্য?— গৌতম জিজ্ঞাসা না ক'রে থাকতে পারলনা।

—সব সময় কি আর দেন? তাঁদের অনেকেরই মশাই এক কথা: রিয়্যালিজম্, বাস্তবতা! আরে বাপু, বাস্তবতা নিয়ে কি আমরা ধুয়ে খাব? ড্রামা ইজ্ ড্রামা। লেখক রাজী হন, ভালোই —নইলে আমরাই দরকার মতন অদল-বদল করে নিই।

গৌতম চুপ করে রইল। এর পরে তার কিছু আর বলবার নেই, বলবার চেষ্টাই অনধিকার চর্চা। কেবল তার 'রাতের তারা' শেষ পর্যন্ত কী রূপ যে নেবে তাই ভেবেই মনটা খারাপ হয়ে যাচ্ছিল।

কিন্তু মন খারাপ করেই বা কী করবে গৌতম। 'রাতের তারা'র যা হওয়ার তাই হোক। তার টাকার দরকার। টাকা নইলে সুমতিকে বাঁচানো যাবে না।

আর তা ছাড়া থাকুক না ছবিতে বড় বড় আদর্শের বুলি, থাকুক সতী-সাবিত্রীর কথা। নারীত্বের দাম যখন আজ কানাকড়ি, আজ যখন ভিটেমাটি হারানো উদ্বাস্তুরূপিণী এই বাঙালী সতী-সাবিত্রীদের নিয়ে শেয়ালে কুকুরে ছেঁড়াছেঁড়ি করছে, তখন নিজেদের ভোলাবার

জন্যে এই মিথ্যেটুকুও অন্তত আশ্রয় করা যাক। যখন লজ্জা, অপমান, ঘৃণায় গোটা জাতিরই আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে হয়, তখন আত্মহত্যা না করে সে বরং ফিল্মই করুক।

আমাদের জীবনের সবই তো অভিনয়। ফাঁকি, ব্যর্থতা, অন্তঃসারশূন্যতা। Men of ashes। তবু আমরা সব ভুলতে চাই। ফাঁপা হৃৎপিণ্ড বাতাসে ফুলিয়ে খেলার মাঠে গিয়ে চিৎকার করি, এক পেয়ালা চা সামনে নিয়ে ক্ষিদের যন্ত্রণা ভোলবার জন্যে রেস্তোরাঁর বেঞ্চিতে বসে তর্ক করি, অভাবগ্রস্ত পরিবারের সমস্ত কুশ্রীতার মধ্যেও এক কোণে কেরোসিনের আলো জেলে বসে' পড়ি দিশি-বিদেশী কবিতার বই, আর ক্যাল্‌শিয়ামের অভাবে অপুষ্ট বাহু তুলে আমরা সেই হাতের মুঠোতেও দৈত্যজয়ের বজ্র ধরতে চাই।

কখনো এই অভিনয়কে অভিনয় বলে জানি, কখনো একে সত্য বলে বিশ্বাস করি, তবু এরই জোরে আমরা বেঁচে আছি; এরই জোরে আজ আমাদের ভেতরে যা শুধু ছাই, তাই একদিন কংক্রীটের মতো শক্ত হয়ে জমাট বাঁধবে। আজকে যা অভিনয় তাকে সত্য করে তুলব, আজকে যা স্বপ্ন তা বাস্তব হয়ে উঠবে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা আজ প্যারডির মতো আবৃত্তি করি, কিন্তু আমাদের নীল-দিগন্তে একদিন সত্যিই ফুলের আগুন লাগবে।

—কী ভাবছিলেন মশাই? —জোয়ার্দারের প্রশ্ন।

গৌতম ঘুম থেকে জাগল।

—না, বিশেষ কিছু নয়। আপনাদের ছবির কথাই চিন্তা করছিলুম।

সেই ছোকরা অ্যাসিস্ট্যান্ট খাতা হাতে এগিয়ে এল।

—শ্রীমতীর ক্লোজ্‌ আপ ক'টা আজ নেবেন না বিশুদা?

—ও তোমরা নিয়ে নাও। আই অ্যাম ভেরি টায়ার্ড।

ছেলেটা চটপট করে চলে গেল। এই ক্লান্ত রঙ্‌ আর ধুলোর

গন্ধে বিস্বাদ পরিবেশের ভেতরে ওকে আশ্চর্য রকম সুস্থ আর সতেজ বলে মনে হল। অনিল মৈত্রের সঙ্গে কোথায় যেন ওর মিল আছে।

গৌতম ঘড়ির দিকে তাকালো। সাড়ে সাতটা। এতক্ষণে মিস্টার সাহার আসা উচিত ছিল।

বিশু জোয়ার্দার বললেন, নতুন একটা গল্প দিতে পারেন গৌতমবাবু ?

গৌতম চমকে উঠল।

—কেন, 'রাতের তারা' চলবে না ?

—চলবে বই কি। ওটা তো সেটল্‌ড্‌। তা বলছি না। —বিশু জোয়ার্দার সিগারেট ধরালেন : একটু আগে যা বলছিলেন, সে সব আমিও ভাবছিলুম। এ সবই আনরিয়্যাল্‌ ফর্মূলার গল্প, একটা নতুন কিছু স্টোরি দিতে পারেন ? আজকের দিনে যে সমস্ত প্রব্লেম, তার ওপর ভালো একটা গল্প ? গল্পের যা ক্রাইসিস হয়েছে সে আর কী বলব আপনাকে।

আজকের দিনের প্রব্লেম। গৌতমের হাসি পেলো। তার চেহারা কি ফোটানো সম্ভব কোনো ছবিতে ? তার বীভৎসতা, তার গ্লানি, তার আসল চেহারাটা—তাকে রূপ দেবার শক্তি আছে কারো, আছে সেই সাহস ? গৌতমের একটা উপমা মনে এল। গলায় ফাঁসি দিয়ে আত্মহত্যা করার পরে কেউ যদি সামনের দেওয়ালজোড়া আয়নায় নিজের শরীরের প্রতিবিম্ব দেখতে পায় —এ যুগের সমস্যার চেহারাও নিখুঁত হয়ে ফুটে উঠলে এ কালের মানুষের সামনে তেমনি ভাবেই দেখা দেবে।

—অবশ্য সেন্সার বাঁচিয়ে।—জোয়ার্দার মনে করিয়ে দিলেন : বুঝতেই পারেন, সব তো অ্যালাউ করবে না—

তার মানে, ওই মৃত্যু পর্যন্তই। মৃত-সঞ্জীবনীর আভাস দেওয়া

চলবে না। আর নইলে একটা অবাস্তব সমাধান—হাসি পায়, দুঃখও হয়। কিন্তু তারই বা কি দরকার? টালীগঞ্জের পথের ধারে যেখানে কালো কাদা, পূর্ববঙ্গের মেয়েটি, একটা প্রাণহীন কুকুর—সেখান থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরেই তো এই স্বপ্নপুরী। রাজা, জমিদার, প্রেম, গান, নাচ, আদর্শবাদ, পল্লীবধূ, বিলেত-ফেরত ক্লাউন, গ্ল্যামার গার্ল। এই তো ভালো। জীবনে প্রতি মুহূর্তেই যখন অভিনয় করে চলতে হয় তখন এই অভিনয়ের জগতে আর ছদ্ম-সত্য কিংবা অর্ধ-সত্যের বিলাস কেন?

জোয়ার্দার বলছিলেন, আছে কিছু ভালো গল্প? মানে একটা ব্লক-স্টোরির মতো হলেই চলবে। আমরা ডেভেলপ্ করে নেব তারপর।

বরেন সাঁতরা কখন উঠে গিয়েছিলেন, গৌতম লক্ষ্য করেনি। এই সময় হঠাৎ ফিরে এলেন তিনি।

সাঁতরা বললেন, মিস্টার সাহা ফোন করেছিলেন।

গৌতম সোজা হয়ে বসল। চকিত হয়ে তাকালেন বিশু জোয়ার্দার।

—কী বললেন? কখন আসছেন? এত দেরী হচ্ছে কেন?

'পততি পতত্রে,—বিচলিত পত্রে।' গৌতম নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসে রইল।

সাঁতরা কেমন কুণ্ঠিত হয়ে গেলেন।

—ইয়ে, দেখুন গৌতমবাবু, আপনি স্যার কিছু মনে করবেন না। মানে, উনি ফাইন্যাল করবার আগে গল্পটা নিয়ে ওঁর এক ফ্রেণ্ডের সঙ্গে একবার ডিস্কাস্ করবেন। আপনি দয়া করে যদি কাল আর একবার—

সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল গৌতম। মাথায় আগুন জ্বলছে। এ-ও

একটা নাটক জমেছে মন্দ নয়। এরা সকলে মিলে তাকে দিয়ে পরম এক নির্বোধের ভূমিকায় অভিনয় করাচ্ছে। চমৎকার!

নিজের চোখ দেখতে পেল না গৌতম। দেখলে চমকে উঠত কিন্তু গলার স্বর শুনতে পেলো। এর আগে সে-রকম স্বর গৌতম কোনোদিন শোনেনি।

—কাল আর আমি আসব না। গল্পও আমি বেচব না আপনাদের। নমস্কার।

তারপরেই সে সোজা বেরিয়ে গেল ফ্লোর থেকে।

—গৌতমবাবু, শুনুন-শুনুন—কাতরোক্তির মতো একবার যেন ডাকলেন বরেন সাঁতরা। কিন্তু গৌতম আর দাঁড়ালো না। এর পরে হয় তো সে বরেন সাঁতরাকেই আক্রমণ করে বসবে।

আপাতত তার মধ্যে যা জেগে উঠেছে তা আদিম। তার অসাধ্য কিছু নেই।

॥ ৩ ॥

ঘরে অদ্ভুত একটা গুমোট গরম। ভাড়া করা পাখাটা খারাপ হয়ে গেল রাত দশটার পর। এত দেরিতে কোথায় আর পাওয়া যাবে ইলেক্‌ট্রিক মিস্ত্রী! ছট্‌ফট্‌ করেই কাটাতে হবে রাতটা।

সুমতি ঘুমিয়ে পড়েছে। এই গরমেও ওর কোনো অসুবিধে হয় না। অথবা হয় তো এ ওর ঘুমই নয়, রক্তহীন, জীবনীশক্তি ফুরিয়ে যাওয়া শরীরে এ কেবল সারাদিনের অবসাদ। এ ঘুম এখন মূর্ছার মতো চেপে ধরেছে সুমতিকে, যেন ও মৃত্যুর মহড়া দিয়ে নিচ্ছে আগে থেকে।

গৌতমের চোখের পাতায় অজস্র পিনের মতো কী ফুটছে, গলার নীচে বালিশটা ভিজে গেছে ঘামে। গাল বেয়ে একবিন্দু লোনা ঘাম ঠোঁটের কোনায় এসে পড়ল। বাতাসহীন ঘরে পুরোনো স্বেদাক্ত গন্ধ, দেওয়াল থেকে লোনা ধরা গন্ধ। অন্ধকারে কেমন খানিকটা ফর্‌ফর্‌ শব্দ হল—একটা পতঙ্গ ছট্‌ফট্‌ করছে, টিকটিকিতে আরশোলা ধরল কোথাও।

পুরোনো বিছানার ক্লেদাক্ত গন্ধ। জীর্ণতা আর দিন-যাপনের প্রতীক। চোখের পাতাদুটোয় অনিদ্রার যন্ত্রণা। একটা জটিল ক্যালকুলাসের অঙ্কের মতো কী যেন ঘুরছে মাথার ভেতর—জটের পর জট, কিছুতেই ফল মিলছে না। সুমতির ফাঁকা বুকের মধ্যে থেকে শাঁ শাঁ করে নিঃশ্বাসের আওয়াজ উঠছে। হঠাৎ মনে পড়ল মৃত্যুর আগে বাবার যখন শ্বাসের টান উঠেছিল তখন ওই রকম শব্দ শোনা যেত একটানা।

জানালাটা খোলা। কিন্তু কিছুই দেখা যায় না। হাত পাঁচেক দূরে একটা কানা দেওয়ালের স্থবির অন্ধকার। একটু হাওয়া নেই কোনোখানে। রাত্রে—অর্থাৎ আরো অনেক রাত্রে হয়তো বৃষ্টি নামবে; কিন্তু সে বৃষ্টিতে শালবনের মর্মর শোনা যাবে না, রমকি' ঝমকি' তিমিরের বীণা বাজবে না, তার ওপরে 'বিজলীর অঙ্গুলি' নেচে বেড়াবে না, সে বৃষ্টি খানিক তরল কাদার মতো গলে পড়বে, গলিতে জমাট আবর্জনা সে বৃষ্টিতে আরো পুতিগন্ধ হয়ে উঠবে, ছোট গর্তটার ভেতর একটা মরা ইঁদুর তাতে ফুলে ফেঁপে উঠবে আর গৌতমের ঘরে বসে-যাওয়া ছাতের শ্যাওলার ভেতর দিয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে জল পড়বে ঘরের মধ্যে।

এই ক্ষয় থেকে, তিল তিল মৃত্যু থেকে সুমতিকে কি বাঁচাতে পারে না গৌতম? মুক্তি দিতে পারে না নীল দিগন্তের ভেতরে, যেখানে জীবন-বসন্তে সৌরভের শিখা জেগেছে? অন্তত কয়েকটা

দিনের জন্তেও কি সে বুঝতে পারেনা—এই বেঁচে থাকার আরো কিছু রঙ আছে, আরো কোনো অর্থ আছে ?

সব যন্ত্রণার চাইতে বড় যন্ত্রণা নিজের অক্ষমতা। পৌরুষের অপমান। গৌতমের বিরুদ্ধে পৃথিবী চক্রান্ত করেছে। কী করতে পারে গৌতম ? কিছুই করতে পারে না। সারারাত গোঙাতে পারে সান্ত্বনাহীন যন্ত্রণায়—ক্লীব-কান্নায় ভেজাতে পারে মাথার বালিশ, নিজের দাঁতে নিজের হাত কামড়ে রক্তাক্ত করে দিতে পারে। আর কিছুই তার করবার নেই।

কেবল শ' চারেক টাকা সে যদি জোগাড় করতে পারত ! তারপর ঃ তারপর কী যে করত ঠিক জানে না। কিংবা ঠিকই জানে। অফিসে ছুটি পা'ক বা না-ই পা'ক তৎক্ষণাৎ সুমতিকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত ঝাঝায়। চাকরি যাক আর থাক।

নিজের একটা আংটি আছে। কত পাওয়া যায় বিক্রি করলে ? গোটা কুড়ির বেশি নয়। সুমতির ভরি-দেড়েক একছড়া হার আছে, তার দামও বড় জোর শ'খানেক টাকা হবে। আর চার গাছা সোনার পাত বসানো ব্রোঞ্জের চুড়ি, হয়তো টাকা পঁচিশেক।

কিছুই দিতে পারেনি সুমতিকে, তার বদলে সামান্ত যা আছে তা-ও কেড়ে নেবে ? তাতেও অর্ধেক হবে কিনা সন্দেহ। সুমতির বাবা যখন বেঁচে ছিলেন, তখন কলকাতায় এলে মধ্যে মধ্যে মেয়ের হাতে দু'দশ টাকা গুঁজে দিয়ে যেতেন। সংসারে খরচ করে তার ধ্বংসাবশেষ হয়ত গোটা পঞ্চাশ টাকা পোস্ট অফিসে পাশ বইতে পড়ে আছে। ব্যাস্—ওই পর্যন্তই।

না—ও পথে নয়। অন্য কোনো রাস্তা দেখতে হবে, ভাবতে হবে অন্য কোনো উপায়।

কিন্তু কী উপায় ? কোন্ রাস্তা ?

তার তখনি মাথার ভেতরে বিদ্যুৎ জ্বলল, চিন্তায় আগুন ধরল। আগ্নেয় হল নিজেরই জতুমূর্তি। বাড়ী ফিরেই শুনেছিল, মা খোকাকে নিয়ে বরানগরে গেছেন। ওখানে দূর-সম্পর্কের এক পিসিমা আছেন, তিনি খবর দিয়েছেন খুব ভালো পাঁচালী গান হবে তাঁদের পাড়ায়। মা গেছেন সেই পাঁচালী শুনতে। রাত্রে থাকবেন, খুব সম্ভব সকালে ওখান থেকে গঙ্গাস্নান সেরে তারপরে ফিরে আসবেন।

শুনেই, বিরক্ত-ক্ষুব্ধ গৌতমের কুৎসিত মেজাজ আরো কুৎসিত হয়ে উঠেছিল। চিৎকার করে বলেছিল, মা গেছেন্ ভালো কথা, কিন্তু লোটনকে নিয়ে গেলেন কোন্ আক্কেলে? হতভাগা ইডিয়ট ছেলে—বি এ, পরীক্ষায় ফেল্ হয়েছে, দু-দিন বাদে কম্পার্টমেণ্টাল —এখন পড়ার চাইতে পাঁচালী শোনাই তার বড় হল?

কিন্তু রাত্রির এই বিষাক্ত গুমোট অন্ধকারে গৌতমের মনে হল: এখন সুযোগ আর আসেনি, আর আসবেনা। মা-র ট্রাঙ্কের একেবারে তলায় একটা ছোট লোহার বাক্স আছে। তাতে মা-র কিছু গয়না রয়েছে—ছোট ছেলের বৌকে দেবার সদিচ্ছায় সেগুলো সঞ্চয় করেছেন তিনি। আর আছে খানতিনেক গিনি, দু'খানা মা-র নিজের, একখানা লোটনকে বাবা দিয়েছিলেন অন্নপ্রাশনের সময়। গৌতমের মধ্যে যে আদিম জেগে উঠেছিল, যে ইচ্ছের তাড়নায় সে বরেন সাঁতরার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে চেয়েছিল সন্ধ্যাবেলায়, এইবার সেই সত্তা তার সামনে এসে দাঁড়ালো। বললে, তোমার সব সমস্যার সমাধান হয়ে যেতে পারে এখুনি। মা আজ রাতে বাড়ী নেই, এমন সুযোগ তুমি আর কখনো পাবে না।

গৌতম সোজা উঠে বসল বিছানার ওপর। মাথার প্রতিটি চুলের তলায় কণা কণা আগুন জ্বলছে। ঘরটা যেন বয়লার-রুমের মতো গরম। কাত হয়ে, হাঁটু বুকের ভেতর গুটিয়ে অবসন্ন ঘুমে

এলিয়ে আছে সুমতি। তার বুকের মধ্য থেকে কাঁপা আওয়াজ উঠেছে চাপা কান্নার মতো। অন্ধকারেও কঙ্কালের মাথার মতো দেখা যাচ্ছে তার কপালটাকে।

মনে পড়ল, মা তাকে পৃথিবীতে আনেননি, তার সাত বছর বয়সের সময় জন্মদাত্রী মা মরে গেলে—তিনি ঘরে এসেছিলেন। মা তার আপন নন্। পঁচিশ বছর পরে গৌতম এই প্রথম ভাবল, মা তাকে কোনোদিন লোটনের মতো ভালোবাসেননি। লোটন তাঁর নিজের ছেলে, তাই সুমতিকে তিনি একজোড়া ছুল দিয়েই কর্তব্য শেষ করেছেন, আর পাঁচ-ছ ভরির গয়না তুলে রেখেছেন লোটনের বৌয়ের জন্যে। ওটা ছোট ছেলের জন্যে প্রশ্রয় নয়, পেটের ছেলের জন্যে পক্ষপাতিত্ব। পঁচিশ বছর পরে গৌতম মনে মনে উচ্চারণ করল, মা তার মা নন্—সৎমা। নিজের মা হলে অন্যরকম হত।

আর সেই জন্যেই সুমতির জন্যে কোন মমতাই নেই ওঁর। এতটুকুও না। তাই চেঞ্জের প্রসঙ্গ উঠলেই এমন বিরূপ। সুমতি মরে গেলে ওঁর কিছু আসে যায় না। লোটনের বৌ হলে অন্য কথা ছিল।

সবাই সমান। ভৌমিক, সাহা—মা, সব এক দলের। কেউ গৌতমের জন্যে ভাবে না। একটা খামখেয়ালী নাটকের নির্বোধের ভূমিকায় সে আরো নির্বোধ এক অভিনেতা; এরা সবাই তার অভিনয় দেখেছ, হাততালি দিয়ে উৎসাহ দিচ্ছে তাকে। ব্যাস, ওই পর্যন্তই।

গৌতমের সব দুর্ভাবনা মিটে যেতে পারে এই মুহূর্তেই। সুমতির আঁচলে যে চাবী আছে, তার একটা দিয়ে মা-র বাক্স খোলা যায়। এই ঘরের খিল খুলেই মা-র ঘরে যাওয়া চলে। সব একটা যোগ অঙ্কের ফলের মত মেলানো।

কিছুক্ষণ নিথর হয়ে বসে নিজের হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনল

গৌতম। অসহ্য গরম। বৃষ্টি নামবার কোনো লক্ষণ নেই এখনো। ঘামে ভিজা মলিন বিছানার গন্ধ। মাতালের চিৎকার শোনা যাচ্ছে গলির মোড়ে। ওখানে একটা ফ্ল্যাশের আড্ডা আছে, মধ্যে মধ্যে মদ খেয়ে ওরা মাতলামি করে।

এমন অবসর আর আসবে না।

কী করতে পারে? সামনের দিকের দরজা খুলে রাখতে পারে। ছড়িয়ে রাখতে পারে কাপড়-চোপড়। চোর এসেছিল। পৃথিবীতে কেউ তাকে কোনদিন সন্দেহ করতে পারবেনা, এমন কি সুমতিও না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত চুরি করবে গৌতম?

সারা গা দিয়ে এবার ঘামের স্রোত নামতে লাগল, যেন অবগাহন স্নান করছে সে। চুরি করবে? হাতের তেলো দিয়ে খানিক ঘাম কপাল থেকে ঝেড়ে ফেলে গৌতম ভাবল, না—চুরি করবে কেন? ওগুলো সে বন্ধক দেবে। সুমতির পাশ-বইয়ের টাকা ক'টা তুলে নেবে। বেচে দেবে হাতের আংটিটা। ব্রজেন দস্তিদার বোধ হয় কিছু দিতে পারবে না, কিন্তু অনিল মৈত্রের কাছে গোটা ত্রিশ টাকা ধার পাওয়া যেতে পারে, ওর বয়েস অল্প, এখনো বিশ্বাস করে মানুষকে।

চুরি করবেনা গৌতম। ধারই নেবে বলতে গেলে।

তিন-চার-ছ' মাসের মধ্যে মা হয়তো টেরই পাবেন না; হয়তো যেমন করে নিয়েছে, তেমনি ভাবেই আবার নিঃশব্দে যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে দিতে পারবে সে। আর মা যদি আগে জানতে পারেন, তাহলে ওগুলো ফিরিয়ে দেবার সময়—। কিন্তু পরের কথা পরে। এত আগে থেকে ওসব দুশ্চিন্তা করে কোনো লাভ নেই।

গৌতমের মন এইবারে যেন মোটামুটি একটা যুক্তির পথ ধরে

খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে এল। চাইলে কি মা দিতেন ? অসম্ভব। সুমতির চেঞ্জের জন্যে তাঁর এক বিন্দু সহানুভূতির বালাই নেই। কাজেই একটুখানি কৌশলের আশ্রয় নিতে হচ্ছে গৌতমকে। না-না চুরি করবার মতো অধঃপাতে এখনো গৌতম যায়নি। তা ছাড়া মা-র গয়না ? ছিঃ ছিঃ।

সোজা বাংলায়, গৌতম ধার নিচ্ছে। ধার শুধু সংমা কেন, নিজের মা-র কাছেও নেওয়া চলে। শোধ দিলেই হবে যথাসময়ে। যুক্তি দিয়ে বুদ্ধি নিরঙ্কুশ হল বটে তবু গৌতম কিছুতেই সংশয় কাটিয়ে উঠতে পারল না। দমচাপা অন্ধকারে মুখে নোনা স্বাদ অনুভব করতে করতে ভূতের মতো চুপ করে বসে রইল। বাইরে মেঘে-আড়ষ্ট আকাশে এক ঝলক বিদ্যুৎ চমকালো আর ঘুমের মধ্যে একবার ফুঁপিয়ে ফুপিয়ে কেঁদে উঠল সুমতি। সে কান্নায় স্মৃতি—সে কান্নায় মৃত-জাতকের জন্যে উচ্ছলিত মাতৃস্তনের যন্ত্রণা। তখন গৌতমের মনে হল, আর অপেক্ষা করা চলেনা, আর অপেক্ষা করলে সে পেরে উঠবে না।

রাত্রে চাবি সুমতির আঁচলে থাকে না, থাকে টেবিলের ওপর। বিছানা থেকে নিঃশব্দে নেমে পড়ল সে। নিজের যুক্তি অনুসারে চুরি করতে সে যাচ্ছে না, তবু কিছুক্ষণ তার পা নড়তে চাইল না, তবু বার বার মনে হল, তার হৃৎপিণ্ডের শব্দে সুমতির ঘুম ভেঙে যাবে। তারপর চোরের মতোই সে এগিয়ে চলল, টেবিল থেকে তুলে নিলে দেশলাই আর চাবির রিংটা। নিজের নিঃশ্বাসের শব্দে চমকে উঠল বারবার। আর হয়তো ভাবল ঃ নাঃ, থাক।

তবু শেষ পর্যন্ত সে মা-র ঘরের খিল খুলেই ফেলল। আর দেখতে পেলো যে প্রকাণ্ড রাক্ষসটা এতক্ষণ তাকে গ্রাস করবার জন্যে অপেক্ষা করছিল, এইবারে সে তার মুখখানা মেলে ধরেছে।

পাইথনের আকর্ষণে হরিণ নাকি তিলে তিলে তার দিকে এগিয়ে চলে। গৌতমও ফিরতে পারল না। সে আর হার মানতে রাজী হয়। আজকের এই শ্বাসরোধী রাত্রে তার পক্ষে অসম্ভব বলে কিছু নেই। একখানা লম্বা ছোরা হাতে করে সে কোনো অন্ধকার পথের বাঁকেও প্রতীক্ষা করতে পারে শিকারের জন্যে, তার চাইতেও ভয়ঙ্কর কিছু করতে পারে হয়তো।

সুমতি ঘুমের ভেতর একটানা ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে চলল। ওই কান্না তার সন্তানের জন্যে। আর সেই গৌতমের জন্যে— ছুপুরের ঝিম ঝিম পার্ক স্ট্রীটে চলতে চলতে যে :গৌতমকে বিলাস মজুমদার শোনাতো এজ্‌রা পাউণ্ডের কবিতা।

—তিন—

[শনিবার : সকাল : দুপুর : সন্ধ্যা]

॥ ১ ॥

গৌতমের মুখের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য হল সুমতি।

—কী হয়েছে তোমার ?

—কিছু হয়নি।

—চোখ বসে গেছে—মুখ কালো। ঘুমোওনি নাকি সারারাত ?

—ভারী গরম।—গৌতম সরে গেল সামনে থেকে।

গয়না আর গিনি তিনখানা কি আবার রেখে আসা চলে ? সুমতি কলঘরে ঢুকেছে। এই ফাঁকে যেখানকার জিনিস সেখানে রেখে আসতে পারে গৌতম ? না—আর পারেনা। যা শুরু হয়েছে, তা শেষ হয়েই যাক।

দরজা খুলে একবার বাড়ীর রোয়াকে এসে দাঁড়ালো। কাল রাত্রির সেই বৃষ্টিটা থেমেছে এতক্ষণে। ঠিক বৃষ্টি নয়—ধোঁয়াটে আকাশ থেকে জলের বিন্দু ঝরে পড়েছে মধ্যে মধ্যে। সাড়ে চার হাত চওড়া গলিটা যেমন পিছল তেমনি নোংরা হ'য়ে উঠেছে তাতে। কর্পোরেশনের ঝাড়ুদার এখনো এসে পৌঁছয়নি, ছোট গর্ত্তটার ভেতরে সেই মরা ইঁদুরটা ছোট একটা বেলুনের মতো ফুলে উঠছে, থেকে থেকে আসছে নাড়ী ওল্‌টানো দুর্গন্ধ, কয়েকটা বড় নীল মাছি এসে ভন্‌ ভন্‌ করছে তার ওপর।

গৌতম মুখ ফিরিয়ে নিলে। এই গলি। এই সকাল। এই জীবন।

ছাত্রজীবনের পড়া কতগুলো কবিতার লাইন। একটা নালা। ক্ষুধিত অস্থিসার বেড়াল। Devours a morsel of rancid butter! পিঠকুঁজো বুড়ী একটা। নুয়ে নুয়ে কী যেন কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে জীবনের পোড়ো জমিতে। তোবড়ানো টিন, ছেঁড়া ন্যাকড়া, আজে বাজে কাগজের ভেতরে প্রেমপত্রের টুকরো, আর ভাঙা কাচ। অসংখ্য ভাঙা কাচ। চলতে-ফিরতে পা রক্তাক্ত হয়ে যায়।

অনেকগুলো কবিতার লাইন। কোনো একটা সম্পূর্ণ কবিতা থেকে নয়। একটা সম্পূর্ণ কবিতাই কি আছে কোথাও? অবিমিশ্র যন্ত্রণার ভেতরে অবাঞ্ছিত রসাভাস ঘটায় আত্মপ্রবঞ্চনার আনন্দ; হাসপাতালে নবজাতকের মৃত্যুনীল মুখে প্রেমের কবিতার যতিপাত।

দুপুরের রোদে—আলোছায়ায় ঝিম-ঝিম, প্রায় অবাস্তব সেমিটারীর পাশ দিয়ে আর পার্ক স্ট্রীটে হাঁটেনা বিলাস মজুমদার। যেদিন হাঁটত সেদিন অনেক কবিতা তার মুখস্থ ছিল। গৌতমেরও। "This is the way the World ends"—

—চা দিয়েছি—

দরজা থেকে সুমতি ডাকল।

গৌতম ফিরে এল ঘরে। চায়ের সঙ্গে কাল বিকেলের আনা পাঁউরুটির টুকরো। তার ওপরে জেলির কমলা রঙের একটুখানি আবরণ। প্রতিদিনের অভ্যস্ত প্রাতরাশ।

রুটিটা গলা দিয়ে নামতে চাইছে না। কাল রাত থেকেই অদ্ভুত পিপাসা জ্বলছে সেখানে। অথবা ঠিক পিপাসা নয়, একটা ছোট শিসের গুলির মতো কী যেন আটকে আছে। ক্যান্‌সার ধরা পড়বার আগে বড় জ্যাঠামশাইও ও-কথা বলতেন।

কোনোমতে রুটি চিবিয়ে, চা গিলে গৌতম উঠে দাঁড়ালো।

সুমতির মুখ আর কপাল হঠাৎ যেন একটা এস্রাজের খোলের মতো দেখাচ্ছে। বিয়ের পরেও বছরখানেক এস্রাজ বাজিয়েছিল সুমতি, বলেছিল, কোনদিন যদি সুযোগ পাও আমাকে একটা গীটার কিনে দিয়ো। কিন্তু সে সুযোগ আর হয়নি। খোলফাটা, তারছেঁড়া এস্রাজ কোথায় ঝুল আর ধুলোর মধ্যে পড়ে আছে এখন।

—মা কখন ফিরবেন জানো?

—সকালেই আসবেন, হয়তো এখুনি এসে পড়বেন।

—আমি একটু বেরুচ্ছি। কাজ আছে।—জামাটা টেনে নিয়ে গায়ে গলিয়ে পকেটের রুমালের পুঁটলিটা শক্ত করে চেপে ধরে গৌতম বললে, যদি বেশি দেরি হয়, তাহলে আর বাসায় ফিরব না, সোজা অফিসে চলে যাব।

—সে কি, খাবে না?

—খেয়ে নেব কোথাও হোটেল থেকে।—গৌতম কাব্‌লী চটীর একটা হারানো পাটির সন্ধান করতে লাগল। সেটাকে তার সঙ্গীর পাশে দেখা যাচ্ছে না।

—ব্যাপার কী? কী এত কাজ?

—আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা ঝাঝা যাচ্ছি—মনে নেই?—শীতলভাবে জবাব দিলে গৌতম।

—আজই সন্ধ্যায়? সুমতি আকাশ থেকে পড়ল: কী বলছ তুমি?

সুমতির চোখের দিকে চাইতে পারলনা গৌতম। খাটের তলায় ঝুঁকে পড়ে চটিটা খুঁজতে গিয়ে তার মনে পড়ল, কাল শোবার আগে একটা অনাহূত বেড়ালকে একখানা জুতো সে ছুড়ে মেরেছিল। সেটা বারান্দায়ই পড়ে আছে।

খোঁড়ার ভঙ্গিতে এক পায়ে জুতো টেনে বেরিয়ে যেতে যেতে গৌতম বললে, কেন, তাই তো কথা ছিল।

—কিন্তু তুমি তো ছুটি পাওনি। তা ছাড়া টাকার জোগাড়ও—

—ছুটি আজ পাব।—এই ছ'মাসে কাব্‌লী চটির স্ট্র্যাপ গৌতম কখনে বাঁধেনি, আজ সে কাজটা তাঁর অত্যন্ত জরুরি মন হল। মেজেয় চোখ রেখে বললে, তাছাড়া টাকা ধার দেবে একজন।

—ধার দেবে? কে ধার দেবে? আরো আশ্চর্য হল সুমতি।

—দেবে—দেবে।—গৌতম বিব্রত হয়ে বললে, কেন আমি কি এতই অপদার্থ নাকি?—অকারণ বিরক্তিতে তার কপাল কুঁচকে এল: তিন-চারশো টাকা ধার দিতে পারে এমন একজন বন্ধুও কি আমার থাকতে নেই? আমাকে কী ভাবো তুমি?

সুমতি দরজার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তখন। গৌতমের বিরক্তিতে সে থমকে গেল মুহূর্তের জন্যে। তারপর আস্তে আস্তে বললে, আমি কিছু ভাবিনি। শুধু বলছিলুম, থাক্ না।

—থাকবে? কী থাকবে? দুটো কালিপড়া চোখে হিংস্র দাহ জ্বালিয়ে জিজ্ঞেস করল গৌতম।

—এই চেঞ্জ। আমি তো বেশ ভালো আছি এখন। অনর্থক আর ধার টার ক'রে—

অকারণে বিশ্রী একটা জান্তব চিৎকার করে উঠতে গিয়ে আত্মসংবরণ করল গৌতম। কাটা ঘায়ে কেন আর নুনের ছিটে দেয় সুমতিও?

—সত্যি, কোনো দরকার ছিল না কিন্তু। সুমতির নীরক্ত শুকনো ঠোঁট অল্প অল্প কাঁপতে লাগল: আমার শরীর তো অনেক সেরে গেছে এখন। এ-সমস্ত না করে তুমি বরং আমাকে সেই টনিকটাই আর এক বোতল এনে দাও। সেইটে খেয়ে তো আমি বেশ জোর পেয়েছি গায়ে। তাছাড়া মাও—

মা!—সেই বিকৃত চিৎকারটা এবারেও সামলে নিলে গৌতম, কিন্তু সবটা পারল না। জুতোর স্ট্র্যাপটা কোনোমতে বেঁধেই

সোজা দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে, মা! মা যদি বিষ খেতে বলেন, তা-ই খেতে হবে? আমি যা বলেছি, তাই কোরো। যদি পারি সাড়ে ন'টায় এসে খেয়ে যাব, নইলে ছুটোর মধ্যে ফিরে আসব। আজ সন্ধ্যার গাড়ীতে আমরা যাচ্ছি। এখন আর কথা বাড়িয়োনা—আমার অনেক কাজ।

অনেক কাজ। অন্তত সেই বলেই বাড়ী থেকে বেরিয়ে এসেছে গৌতম।

কাজ একটুখানি আছে। কলেজ স্কোয়ারের রেলিং ধরে জলের দিকে তাকিয়ে গৌতম ভাবল। রুমালেব পুঁটলিতে তিনখানা গিনি, সামান্য কিছু গয়না। সেটা মুঠোয় চেপে চেপে ধরতে হাতের তেলোয় কিসের খোঁচা লাগল একটুখানি। যেন মৃদু প্রতিবাদ একটা।

ধোঁয়াটে আকাশ মাথার ওপর। বৃষ্টি নেই—জলের গুঁড়ো উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। কলেজ স্কোয়ারের গাছপালাগুলো আশ্চর্য সবুজ। হাওয়া লেগে সামনের নীল জলে সমুদ্রের মতো ঢেউ খেলছে। সমুদ্র। বাবা তখন বেঁচে। দল বেঁধে ওরা কলেজ থেকে এক্সকার্শনে গিয়েছিল দক্ষিণ ভারতে। সপ্ত মন্দিরের শিল্প-তীর্থ—মহাবলীপুরম্।—কী নীল, কী নীল সমুদ্র। সে রঙ গৌতম আর কখনো দেখেনি। (না, আরো একবার দেখেছিল। ডাক্তার-খানায় কী একটা ওষুধের শিশিতে। তার গায়ে ছোট শাদা লেবেলের ওপর লাল রঙে লেখা ছিল ঃ পয়জন।) আসলে সমুদ্রই নীল দিগন্ত। ফেনায় ফেনায় তার ফুলের আগুন জ্বলছে। কিন্তু মহাবলীপুরম্ এখন অনেক দূর। জন্মান্তরের পারে। রেলিং ধরে আরো অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল গৌতম। তারপর যখন পা ব্যথা করতে লাগল তখন আস্তে আস্তে একটা প্যাভিলিয়নের মধ্যে এসে বসে পড়ল।

হাতের তলায় মাথা দিয়ে মাঝ বয়সী একটা লোক চিৎ হয়ে শুয়ে আছে সেখানে। গোলগাল মোটা চেহারা, মাথায় বারো আনা টাক, চোখে চওড়া ফ্রেমের চশমা। গায়ে একটা আধময়লা ছিটের সার্ট। ভদ্রলোক খুব সম্ভব শিক্ষিত। ইউনিভার্সিটির সামনে দাঁড়িয়ে দুপুরের দিকে তাকে দু'চার দিন উদাস কণ্ঠে প্রেমের গান গাইতে শুনেছে গৌতম। নিউরটিক পাগল।

ওপর দিকে চোখ তুলে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। একটু পরে বিড় বিড় করে কী আউড়ে চলল। কান পেতে শুনল গৌতম। "গীত-গোবিন্দ।" 'রতিসুখসারে গতমভিসারে মদনমনোহরবেশম্'—

দোকান এখনো খুলতে দেরী আছে। সুতরাং গয়নাগুলোর ভার বইতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত। গৌতম স্বচ্ছন্দে আরো ঘণ্টা দুই পর বেরুতে পারত বাসা থেকে। কিন্তু পকেটে চুরি করা (না, ধার করা) গয়নাগুলো রেখে সুমতির সামনে বেশিক্ষণ থাকা তার পক্ষে অসম্ভব। ধরা পড়ে যেত।

মা কি ফিরে এসেছেন এখন ?

হৃৎপিণ্ডটা থমকে গেল একবারের জন্যে। যদি কোন কারণে মা ট্রাঙ্কের তলায় গয়নার বাক্সটা খুলে দেখেন, একবার ? কান ঝাঁ ঝাঁ করে উঠল এবার। কপাল গরম হয়ে উঠল।

পাগল উঠে বসল এবার। "গীত গোবিন্দ" ছেড়ে চিৎকার করে গান জুড়ল প্রাকৃত ভাষায়।

"আর যাবনা জল আনিতে কদমতলায় দাঁড়িয়ে কালা—"

গৌতম উঠে পড়ল।

তার দিকে বিচিত্র একটা চোখের কটাক্ষ ফেলে লোকটা গেয়ে চলল :

"যত বলি সরো সরো সরে না শ্যাম নটবর,
ততই কালা হেঁসে হেঁসে—"

দ্রুত বেড়িয়ে পড়ল গৌতম। চলতে লাগল কলেজ স্ট্রীট দিয়ে।

মেডিক্যাল কলেজ। রক্তের অক্ষরে লেখা 'ব্লাড্ ব্যাঙ্ক্।' স্ট্রেচারে করে সাদা কাপড়ে ঢাকা কাকে যেন নিয়ে যাচ্ছে ভেতরে। ফুটপাতে খানিকটা ব্যাণ্ডেজের প্লাষ্টার।

রক্ত, মৃত্যু, ব্যাধি।

ছাল ছড়ানো ঝুলন্ত পাঁটা। ডাক্তারী বইতে হিউম্যান ফিজিয়োলজীর রঙিন ছবি। বহুকাল আগে পড়া একটা কবিতার অকারণ স্মৃতি-বুদ্বুদ। Metamorphosis of a Vampire—

(মা কি ট্রাঙ্ক খুলেছেন এখন ? ছোট গয়নার বাক্সটার দিকে চোখ পড়েছে তাঁর।)

গৌতম জোরে পা চালাল। বাঁ দিকের কালী মন্দিরে বাজনা বাজছে। দুটি প্রৌঢ় স্ত্রীলোক দাঁড়িয়ে আছে ভক্তিভরে। চেহারা দেখলেই ওদের চেনা যায়। হাড়কটা গলির দুটি বিগত-যৌবনা রূপোপজীবিনী। হাড়কাটা গলি নাম কেন ? এককালে এখানে শিঙের আর হাড়ের কাজ হত। এখনো হাড় কাটে। তবে মোষের নয়।

(বাক্স খুলে মা দেখলেন, গয়না নেই। প্রথমে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলেন না। মনে হল, স্বপ্ন দেখছেন। তারপর আঁতি পাঁতি করে খুঁজতে লাগলেন কাপড় চোপড়ের ভেতর।)

ডাইনে রাস্তা দিয়ে একটা কুকুর এক টুকরো শাদা হাড় মুখে করে দৌড়ে পালাচ্ছে। হাড়কাটা গলির হাড় নাকি ? এই রাস্তাতেই কিছুদিন আগে একটা খুন হয়েছিল না ? দিন-দুপুরে ? আর ওই লাল রঙের বাড়ীটা ? খোকা হওয়ার জন্যে ওইখানেই না সে ভর্তি করেছিল সুমতিকে ?

(মা এখনো বিশ্বাস করছেন না। অসম্ভব—হতেই পারে না।

চোখ ছুটো তাঁর আতঙ্কে বিভ্রান্ত, হাত থরথর করে কাঁপছে।)
সিনেমার পোস্টার। ছানার জলের গন্ধ। পাশে একটা রেস্তোর াঁয় কাট্‌লেট্‌ ভাজছে। বাদাম তেলের গন্ধ। গৌতম দাঁড়িয়ে রইল একটা পোস্টে হেলান দিয়ে।

সামনে একখানা হাত এগিয়ে এল। অবগুণ্ঠিতা একটি মেয়ে। তার কোলে সাত আট মাসের একটি শিশু। টালীগঞ্জের সেই মেয়েটাই নয় তো ?

—বাবা !—ক্ষীণ কণ্ঠের প্রার্থনা।

কঠিন হতে চেষ্টা করল গৌতম। বুদ্ধিমান বন্ধু বান্ধবেরা বলে, এদের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। অভাবে পড়ে এরা ভিক্ষে করে না —এ হল এদের প্রফেশ্যান। ওরা ছু আনা চার আনা দিয়ে বাচ্চাগুলোকে ভাড়া করে আনে। তবু পকেটে হাত দিল গৌতম। সেই রুমালটা হাতে ঠেকল। যেন খেয়ালের ঝোঁকেই মনে হল, কেমন হয় ওই রুমাল শুদ্ধু সব গয়নাগুলো ওকে তুলে দিলে ? নেবে ? সাহস পাবে নিতে ?

একটা নয়া পয়সা উঠে এল হাতে। দিতে লজ্জা করে।

—বাবা !—আবার সেই প্রার্থনা।

কিন্তু পয়সা আর নেই—ছুআনী আছে একটা। অতটা দাক্ষিণ্য চলবে না।

—হবে না, মাপ করো—

একটা পোস্ট থেকে সরে সে আর একটা পোস্টের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

কেমন বিশ্রী লাগছিল। ছু আনা পয়সা ওকে না দিতে পারার গ্লানি। আত্মমর্যাদার বিড়ম্বনা।

তারপরেই নিজের পৌরুষকে সান্ত্বনা দিলে গৌতম। কেন ভিক্ষে দেবে ? বয়েস, আছে, খেটে খেলেই পারে।

তা পারে। কিন্তু এদেরই একজন নিতাই মামাকে তার জবাব দিয়েছে।

—ভদ্রলোকের বাড়ীতে তো খেটেই খেতে গিয়েছিলুম বাবু। —মেয়েটির গলা থেকে বিষ ঝরে পড়ছিল : তার বদলে কোলে এই ছেলে পেয়েছি আর গিন্নী বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। জানেন বাবু, কর্তা নামকরা লোক—খবরের কাগজে তার ছবি ছাপা হয়।

নিতাইমামা আর দাঁড়াতে পারেনি। মেয়েটার চোখের দিকে তাকিয়ে তাড়া খাওয়া কুকুরের মতো পালিয়ে গিয়েছিল।

সামনে দিয়ে কর্পোরেশনের একটা ময়লা ফেলা গাড়ি চলে গেল। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "অতি ভৈরব হরষে।" ছুটো ছাই মাথা ডাবের খোলা ছুপ্ দাপ্ করে রাস্তার ওপর এসে পড়ল, একরাশ ময়লার পুষ্পবৃষ্টি হল, আর একটা পচা শালপাতা উড়তে উড়তে গৌতমের পায়ের কাছে এসে আশ্রয় নিলে।

আবর্জনা। ছুর্গন্ধ। ব্লাড্ ব্যাঙ্ক। স্ট্রেচারে সাদা কাপড়ে ঢেকে কাকে যেন ভেতরে নিয়ে গেল। কাছেই দোকানে ঝুলন্ত ছিন্নশির পাঁঠার মাংসময় আবাহন—ডাক্তারী বইয়ের রঙীন হিউম্যান ফিজিয়োলজী। আর সকাল থেকেই একটা রাসায়নিক বিশ্লেষণ চলছে গৌতমের ভেতরে। প্রত্যেকটা জিনিষের ভেতর থেকেই তার মন খুঁজে নিচ্ছে তার বিচিত্র অসঙ্গতিকে—সারা পরিপার্শ্ব যেন কতগুলো রক্তমাখা স্লাইড। আজকের কলকাতা তার চোখে ফুলে উঠা একটা ইঁছুরের মতো ঘোলাটে আকাশের নীচে হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে। মহাবলীপুরমের সমুদ্র। নীল দিগন্ত। সে নীল কলকাতার আর কোথাও নেই—কেবল আছে ডাক্তারখানার একটা বিষের শিশিতে!

(মা কী করছেন ? সুমতিকে ডাকলেন ? সুমতি এসে বললে,

'কী হয়েছে মা ?' মা জবাব দিতে পারছেন না। তাঁর জিভ জড়িয়ে গেছে। কেবল নিঃশব্দে গয়নার বাক্সটা দেখালেন।)

গৌতমকে বেরুতেই হবে কলকাতা থেকে। আজ সন্ধ্যেতেই। ঝাঝার পাহাড়। একটা রাঙা মাটির পথ চলেছে গাঁয়ের দিকে। এখন কি শালের ফুল ফোটে ?

(মা এবার কপালে ঘা দিলেন। ডুকরে উঠলেন কান্নায়। বললেন—)

গৌতম আর দাঁড়ালো না। ডালহাউসি স্কোয়ারের দিক থেকে ট্রাম আসছিল, উঠে বসল এক লাফে।

বিস্কুট, সিরাপ আর বার্লির বিজ্ঞাপন। লিভারের অব্যর্থ পেটেন্ট ওষুধ। মাদ্রাজী ফিল্মের বিশেষ ধরণের স্থূল প্রচার চেষ্টা। এত টাকা ওরা খরচ করে—রুচি নেই কেন ? আশ্চর্য,। সিনেমার লোকেরা কেন সাবালক হয় না ?

তার 'রাতের তারা' যদি ফিল্ম হত—

গৌতম বাইরের দিকে মুখ ফেরালো। রক্ত গরম হয়ে উঠতে চাইছে। না—ওসব আর নয়। স্বপ্ন দেখার অর্থ হয় না।

বৌবাজার আমহার্স্ট স্ট্রীটের মোড়। দুপাশে বাঙালী মেয়েদের কল্পজগৎ। সারি সারি গহনার দোকান। নেমে পড়ল ট্রাম থেকে। আর দ্বিধা নয়। যা হওয়ার হয়ে গেছে, এখন শেষ পর্যন্তই যেতে হবে তাকে।

একজন সবে দোকান খুলে গণেশকে ধূপ দিচ্ছে। দেওয়ালের খেলো আয়নায় গৌতমের বিকৃত প্রতিচ্ছবি পড়ল।

—কী চান ?

সঙ্গে সঙ্গে কুঁকড়ে গেল গৌতম। পকেটের ভেতরে তার হাত রুমালটাকে আঁকড়ে রেখেছিল, সে হাত কিছুতেই সে বের করতে পারল না। কে যেন টেনে আটকে রাখল।

—না, কিছু না।

গয়নার দোকানের মালিক চশমার ভেতর দিয়ে চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন। সন্দেহ ফুটে উঠল চোখেমুখে।

গৌতম একবার ঢোক গিলল: মানে, এই গিনির দর কত আজকাল—তাই জানতে এসেছিলুম।

—ছিয়াত্তর টাকা। নেবেন?

—পরে নেব—এখন থাক।

দ্রুত পায়ে সরে গেল সামনে থেকে। কিন্তু দোকানদারের চোখ সে ভুলতে পারছে না। কী ভাবলেন ভদ্রলোক? দিনদুপুরেই রাহাজানি করতে এসেছে? পকেটে রিভলভার ধরা আছে তার? হাত বোমা একটা?

কিন্তু এ চলবে না। কিছুতেই চলবে না। গয়না যখন বের করে এনেছে, বিক্রী করার সাহসও তার থাকা দরকার। গৌতম কাপুরুষ নয়।

অসময়ে পান কিনে খেল একটা, যেন খানিক শক্তি সঞ্চয় করে নিতে চাইল নিজের ভেতরে। তারপরে সোজা বীরের মতো ঢুকে পড়ল পাশের গয়নার দোকানে। এবার আর কোন দ্বিধা করল না।

—আসুন, আসুন।

চোখ কান বুজে গৌতম বললে, পুরোনো গয়না কেনেন আপনারা?

—কিনি বই কি। এনেছেন নাকি কিছু?

কিন্তু এবারেও পারল না গৌতম। কিছুতেই পারল না। পকেটের মধ্যে হাতটা কে যেন লোহার আংটা দিয়ে আটকে ধরেছে। সেই নিষ্ঠুর শক্তিটার শাসন।

অসম্ভব—অসম্ভব।

*

কাঁপা-কাঁপা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে গৌতম বললে, না, জেনে নিচ্ছি। পরে আসব এখন।

পারবে না,—কিছুতেই পারবে না সে। সাহস নেই, শক্তি নেই তার। সে যে কতবড় কাপুরুষ, আজ তা আরো একবার প্রমাণ হয়ে গেল। জীবন তার জন্যে নয়। সুমতি মরতে পারে আর সে পারে কেবল আত্মহত্যা করতে।

গৌতম সোজা হাঁটতে সুরু করল শশিভূষণ দে স্ট্রীট দিয়ে। পা দুটো আর বইছে না। কোথাও গিয়ে এখন বসতে হবে তাকে। শরীরে মনে বিন্দুমাত্র উদ্যম আর অবশিষ্ট নেই তার। কাল সারারাত সে ঘুমোয় নি।

এখন একটি মাত্র আশ্রয়ের জায়গা আছে। নেবুতলা স্কোয়ারে। কয়েকটা পাম গাছ। কিছু ঘাস। নীল দিগন্তের মৃত স্বপ্ন।

কয়েকটা পাম গাছ। তাদের সঙ্গে অরণ্যের আর কোন সম্পর্ক নেই—সারা গায়ে ছোট ছোট পোস্টার আঁটা: হাঁপানির মাদুলি থেকে ধবলের মহৌষধ। বিবর্ণ ঘাসের ভিতর পোড়া সিগারেট আর চিনে-বাদামের খোসা। একটা ছেঁড়া নীল শাড়ি দুলছে ওদিকের পুরোনো বাড়ীটার ছাতের ওপর। নীল দিগন্তের মৃত স্বপ্ন।

ঝিম ধরে বসে রইল গৌতম। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল, পাম গাছের ওপর কাকেরা বাসা বাঁধছে। ছোট ছোট কাঠি, ছেঁড়া তারের টুকরো, শুকনো পাতার আঁশ—যা পাচ্ছে নিয়ে যাচ্ছে কুড়িয়ে। বিশ্রী বাসা তৈরি হচ্ছে একটা। কোথাও কোনো শ্রীছাঁদ নেই—। গৌতমের বাসার সঙ্গে মিল আছে।

জোড়ার একটা উড়ে গিয়ে বসল ও-পাশের তেতলা বাড়ীর এরিয়ালের ওপর। ঠোঁট দিয়ে প্রাণপণে ছিঁড়তে চেষ্টা করছে

এরিয়ালের তার। গৌতম লক্ষ্য করতে লাগল। তার মতোই ধৈর্যের পরীক্ষা দিচ্ছে কাকটা। দেখা যাক না—তারটা ছিঁড়তে পারে কিনা। যদি পারে, সে-ও অপেক্ষা করবে না আর। সামনে যে গয়নার দোকানটা পাবে—চোখ কান বুজে ঢুকে পড়বে তারই ভেতরে।

—উঃ, আর পারা যায় না—

গৌতম চমকে উঠল। তারই বেঞ্চিতে আর একটি ভদ্রলোক এসে বসেছেন। তাঁরই স্বগতোক্তি।

গৌতম ফিরে চাইতেই বললেন, পরের জন্যেই খেটে মরলুম মশাই। চাকরি দেবার জন্যে ঘুরে বেড়াচ্ছি—অথচ নেবার লোকের পাত্তা নেই।

শুনে পা থেকে মাথা পর্যন্ত শিরশিরিয়ে উঠল গৌতমের। সত্যযুগ ফিরে এসেছে নাকি পৃথিবীতে? এই বাজারে চাকরি দেবার জন্যে একজন উপযাচক হয়ে বেড়াচ্ছেন—অথচ নেবাব লোক উধাও! নিজের কানকে তার বিশ্বাস হল না।

ভদ্রলোকের বয়েস ষাটের ওপর। রোগা, লম্বা চেহারা। মাথায় ছাঁটা-ছাঁটা চুল। পরণে সস্তার সুট, টকটকে লাল রঙের টাই, সবুজ রঙের ফাউনণ্টেনপেন, হাতে একটা ফ্ল্যাট্-ফাইল।

বলে চললেন, এম্প্লয়মেণ্ট্ এক্স্চেঞ্জ থেকে আসছি। সার্পেন্-টাইন লেনের এক ভদ্রলোকের দুশো টাকা মাইনের চাকরি হয়ে গেছে। মানে ভাত বাড়াই আছে, কেবল খেতে বসলেই হয়। এসে শুনলুম, কলকাতার বাইরে গেছেন—ফিরতে বেলা বারোটা হতে পারে—দুটোও হতে পারে। অথচ আজ এগারোটার মধ্যে অফিসে দেখা না করলে চাকরিটা বেহাত হয়ে যাবে। কী কপাল দেখুন লোকটার!

গৌতম সহানুভূতি বোধ করল: কপাল ছাড়া কী আর!

—সেই গল্পটা জানেন তো ?—ভদ্রলোক অন্তরঙ্গ হয়ে উঠলেন : শিব আর পার্বতী বাজী রাখলেন। তারপর লোকটার পায়ের কাছে ফেলে দিলেন মোহরের থলি। লোকটা বেশ আসছিল, হঠাৎ ভাবল অন্ধেরা কেমন করে হাঁটে একবার পরখ করা যাক। বলে, চোখ বুজে হাঁটতে হাঁটতে ঠিক টাকার থলেটা পার হয়ে গেল। এও ঠিক তাই হয়েছে—হা-হা-হা—

গলা ছেড়ে হেসে উঠলেন। যে কাকটা কুটো কুড়োচ্ছিল—চমকে উড়ে গেল গাছের মাথায়। জোড়ার আর একটা তখনো প্রাণপণে এরিয়ালের তার ছিঁড়তে চেষ্টা করছে।

গৌতম ভুরু কোঁচকালো।

—আপনি বুঝি চাকরি করেন এমপ্লয়মেণ্টে ? কিন্তু আপনার তো রিটায়ার করার বয়েস হয়ে গেছে।

—রিটায়ার তো করেই ছিলুম মশাই। কিন্তু এফিসিয়েণ্ট্ অফিসারদের ওরা আজকাল কিছুতেই ছাড়তে চায় না—জানেন তো ? দিল্লী থেকে রিটায়ার করেছি—ফের কলকাতায় পোস্টিং করে পাঠিয়ে দিলে। অথচ আমার চাকরির কী দরকার, বলুন। দুই ছেলেই গবর্ণমেণ্টের গেজেটেড্ অফিসার। এক মেয়ে—তার বিয়ে দিয়েছি প্রফেসারের সঙ্গে। এলাহাবাদে বাড়ী আছে, পুরীতেও সমুদ্রের ধারো ছোট বাংলো করেছি একখানা। ভেবে ছিলুম, পেন্‌শন্ নিয়ে সমুদ্রের ধারেই শান্তিতে দিন কাটাব আর জগন্নাথ দর্শন করব—কিন্তু বরাতটা দেখুন একবার।

পুরী! সামনে সমুদ্র। নীলের পরে আরো নীল—হালকা নীল, অন্ধকারের মতো গভীর নীল। গৌতম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—নিলেন কেন চাকরি ? রিফিউজ করলেই তো পারতেন।

—পারলুম কই !—বাঁধানো দাঁতের নিচের পাটিটা শক্ত করে চেপে দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, চারদিকে কিরকম দুর্নীতি জানেন তো!

এমপ্লয়মেণ্ট একস্‌চেঞ্জে তার কত স্কোপ্‌ ভেবে দেখুন। তাই দু চারজন অনেস্ট্‌ অফিসার থাকা দরকার। নিজের কথা বলতে নেই মশাই, তবু বলব, আমরা ক'জন ওখানে আছি বলেই ওখান-কার আবহাওয়া একেবারে ক্লীন—কোনো নেপোটিজমের বালাই নেই।

—খুব ভালো কথা।

ভদ্রলোক এবারে গৌতমের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। অন্তরঙ্গ হয়ে বললেন, জানেন, আমি পার্কে বসে সময় কাটাচ্ছি, অথচ সামনে শশিভূষণ দে স্ট্রীটেই আমার শ্বশুরবাড়ী।

—তাই নাকি ?

—তবু আমি যেখানে যাই না। আমার মাদার-ইন্‌-লর সঙ্গে মুখ দেখাদেখি বন্ধ।

—কেন ?

—মাস তিনেক আগে একজন লোককে সঙ্গে করে তিনি আমার বাসায় হাজির। পাঁচশো টাকা হাতে দিয়ে বললেন, এই লোকটির একটা চাকরি করে দিতে হবে। টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে মাদার-ইন্‌-লকে আমি বললুম, মা, গরিব হতে পারি, কিন্তু আমার মনুষ্যত্ব আছে। আপনি যদি আমায় এমনি অনুরোধ করতেন, তা হলে আমি হয়তো চেষ্টা করে দেখতুম। কিন্তু টাকা নিয়ে যখন ঘুষ দিতে এসেছেন, তখন জানবেন—আপনার সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্কই নেই।

লোকটির চরিত্রবল দেখে অভিভূত হল গৌতম। তেতলার ছাদে কাকটা এরিয়ালের তার নিয়ে টানাটানি করছে। উদ্যমের অন্ত নেই ওর।

বাঁধানো দাঁতের পাটি আর একবার ঠিক করে নিয়ে ভদ্রলোক হাসলেন: টাকা দুদিন পরেই ফুরিয়ে যাবে মশাই—

পাপটা জমে থাকবে চিরকালের জন্যে। সে যাক। আপনি কী করেন ?

কী খেয়াল হল গৌতমের। বলে ফেলল : কিছুই না।

—বেকার ? —চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল ভদ্রলোকের।

—একেবারে।

—কার্ড করিয়েছেন এম্প্লয়মেণ্টের ?

—নাঃ!

—ঈস্-স্! —জিভের ডগটা তালুতে ঠেকিয়ে প্রায় হাহাকার করলেন তিনি : কোয়ালিফিকেশন ?

—এম, এ পর্যন্ত পড়েছিলুম।

—আহা-হা! —এবার দুঃখে অভিভূত হয়ে পড়লেন এম্প্লয়মেণ্টের লোকটি : বাড়ীর অবস্থা—

—খুব খারাপ।

—হায় হায়। —বুড়ো মানুষটি আর নিজেকে সামলাতে পারলেননা : কী যে হয়েছে মশাই বাঙালির, জাতটাই এবার রসাতলে যাবে। অথচ আমার হাতেই আর একটা দেড়শো টাকা মাইনের চাকরি ছিল। আপনার নামটা যদি একবার লিখিয়ে রাখতেন—ঈস্!

গৌতমের সমস্ত জিনিশটা একবারে মন্দ লাগল না। সারা রাত, সমস্ত সকালের অসহ্য মানসিক পীড়নের পরে খানিকটা লঘু কৌতুকের বোধ হয় দরকার ছিল। আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলে, কোনো উপায় হয় না ?

—উপায় ? —ভদ্রলোক বিমর্ষ মুখে চুপ করে রইলেন কিছুক্ষণ : দেখুন, আইন যেখানে, বে-আইনও সেখানে চলে। ব্যাক-ডেট্ দিয়ে একটা কার্ড আমি আপনাকে করে দিতে পারি, গোটা তিনেক টাকা লাগবে। আপনার অবস্থা দেখে মনে হচ্ছে,

অফিশিয়াল্ আইন-কানুনের ওপরে আর একটা বড় জিনিশ আছে —যার নাম মনুষ্যত্ব। —একটু থেমে দাঁতের পাটিটা ঠিক করে নিলেন ঃ আমার আর কী বলুন—দুদিন পরেই সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে গিয়ে বসব পুরীর বাড়ীতে—সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে বাকি জীবনটা কেটে যাবে। তবু এর মধ্যে যদি দু একজন বাঙালির একটু উপকার করতে পারি—

ভুরু কুঁচকে আবার ভাবলেন মিনিখানেক। যেন নিজের বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করছেন। তারপর পকেট থেকে একটা নোটবই বের করে ফস্ করে তাব পাতা ছিঁড়ে ফেললেন একখানা ঃ যাক, ভালো করছি কি মন্দ করছি, ভগবানই বিচার করবেন। দিন তিনটে টাকা, রসিদ লিখে দিচ্ছি। এইটে নিয়ে ভিড় ঠেলে একেবারে ক্লার্কের কাছে গিয়ে এল-এম ব্যানার্জির নাম করবেন। তারা আপনাকে—

প্রহসনটা এইবারে থামানো দবকার। জায়গাটাতে রোদ এসে পড়েছে—চোখমুখ জ্বালা করছে গৌতমের। ফস করে জিজ্ঞেস করে বসল ঃ জেল থেকে বেরিয়েছেন কবে ?

নোটবইয়ের কাগজে থম্‌কে গেল এল-এম ব্যানার্জির কলম।

—কী বললেন ?

—বলছিলুম, সামনে ওই লাল বাড়িটা দেখতে পাচ্ছেন ? ওটা মুচিপাড়া থানা। ওখানে আপনার এক-আধখানা ফোটো থাকা সম্ভব। কিন্তু ভাবছিলুম, তিনটে টাকার জন্যে এতগুলো কথা বললেন—ব্যবসা চালান কী করে ?

এল-এম ব্যানার্জির মুখ শাদা হয়ে গেল। দাঁড়িয়ে পড়লেন সঙ্গে সঙ্গে। তোৎলানো গলায় বলতে চেষ্টা করলেন ঃ কী-কী সব আবোল-তাবোল বকছেন ? আমাকে—আমাকে কি জো-জো-জোচ্চোর ভাবলেন ?

—আমি কিছুই ভাবিনি। চলুননা—থানার লোকে কী ভাবে একবার শুনে আসা যাক।

তারপরেই ভোজবাজীর মতো ঘটল ব্যাপারটা। প্রায় এক লাফে পার্ক পেরিয়ে গেলেন এল-এম ব্যানার্জি। আর একটি লাফে সার্পেন্‌টাইন লেনের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

হেসে উঠতে গিয়েও হাসতে পারলনা গৌতম। জুয়াচোর—ইণ্ডিয়ান পেনাল কোডের ধারায় চল্‌তি নাম ঃ ফোর টুয়েন্টি। ধরা পড়লে চার ছ'মাস জেল খাটে, তার চাইতেও বেশি খায় প্রহার। ষাট বছর বয়েস হয়েছে, কতবার জেল খেটেছে কে জানে—তবু এখনো এই করেই বেঁচে থাকতে চায়।

কৌতুক নয়—রাগ নয়—করুণায় মন ভরে উঠল গৌতমের। অনেক মিথ্যে কথাই বলে গেল—কিন্তু তার মধ্যে মাখিয়ে দিয়ে গেল নিজের স্বপ্নের রঙ। দুই ছেলে গেজেটেড্‌ অফিসার, রিটায়ার্ড লাইফ—নীল সমুদ্রের ধারে ছোট একটি বাংলা—

এ ও নীল দিগন্তের স্বপ্ন দেখছে। যে শান্তি, যে সংসার, যে বিশ্রামকে কোনোদিন পাবেনা—তারই কথা সাজিয়ে বলে কেবল কি মানুষকেই ঠকাচ্ছে, না সেই সঙ্গে ঠকাচ্ছে নিজেকেও? মনে প্রাণে এই লোকটাও কি চায়না সে সৎ হোক—চারশো টাকা ঘুষের প্রলোভন জয় করবার শক্তি আসুক তার? এ-সব কি কেবল জুয়াচোরের বানানো কথা, না এদের মধ্যে তার কল্প-কামনাও লুকিয়ে আছে?

সেই স্বপ্নই তো গৌতমকে কাল রাতে পাগল করে দিয়েছিল। নতুন করে মনে পড়ল সব, বুকের ভেতর হিম হয়ে এল। মা-র গয়না সেও চুরি করছে। এই লোকটার সঙ্গে তার তফাৎ কোথায়?

এরিয়ালের আশা ছেড়ে কাকটা কোথায় উধাও হয়েছে। পার্কে

যে কুটো কুড়োচ্ছিল তাকেও দেখা যাচ্ছেনা আর। কাকেরাও কি স্বপ্ন দেখতে জানে? কিসের স্বপ্ন দেখে ওরা?

গায়ে রোদ পড়েছে—জ্বালা করছে চোখমুখ। গৌতম উঠে পড়ল। ধীরে ধীরে বেরিয়ে এল পার্ক থেকে। কোথায় যাওয়া যেতে পারে এখন? আবার গয়নার দোকানে?

—আপনি এদিকে?

গৌতম চকিত হল। অফিসের সেই টাইপিস্ট্ মেয়েটি। উমা সেন। যার কপালে কল্পনায় চন্দনের তিলকরেখা দেখেছিল, টাইপ-রাইটারের ওপর যার আঙুল ঠিক সেতারের তারে তারে খেলা করে যাচ্ছিল। ব্রজেন দস্তিদারের রসিকতা মনে পড়ল—কেমন অপরাধী বোধ হল নিজেকে।

—এই—এই একটু কাজে এসেছিলুম।

—অফিস নেই?

—হ্যাঁ—একটু পরেই যাব। কিন্তু অফিস তো আপনারও আছে?

—না, আজ ছুটি নিয়েছি। একবার দমদম সেণ্ট্রাল্ জেলে যেতে হবে।

—জেলে? কেন?

উমা সেন স্নিগ্ধ শান্তমুখে শীর্ণভাবে হাসল: আপনার যদি দেরি না হয়ে যায়, তা হলে আসুন না আমাদের বাসায়। চা খাবেন এক পেয়ালা। এই সামনের গলিতেই আমরা থাকি।

একবার দ্বিধা করলে গৌতম। তারপর বললে, চলুন।

বাসার অবস্থা প্রায় তারই মতো। একতলার ঘর, স্যাঁৎসেঁতে উঠোনের একপাশে কল, সবুজের ছোপলাগা পলেস্তারাখসা দেওয়াল। বাইরের ঘরে পুরোনো গোটা দুই চেয়ার, একটা টেবিল তক্তপোশে ময়লা সুজনি।

—বসুন। উমা সেন কুণ্ঠিত ভাবে বললে, ঘরে পাখা নেই, অসুবিধে হবে।

গৌতম সপ্রতিভ হতে চেষ্টা করলে: পাখা না থাকলে বসতে পারব না, আমাকে দেখে কি সেই জাতের মনে হয় আপনার ?

—একটু বসুন, চা আনাই—উমা হেসে ভেতরে চলে গেল।

টেবিল থেকে খবরের কাগজটা কুড়িয়ে নিলে গৌতম। খাদ্যসচিব সুন্দরবনের কৃষকদের অভয় দিয়েছেন। গৌতম কাগজ নামিয়ে ফেলল। পথের ধারে আঁচল পেতে বসে আছে চাষী বউটি। বড় বাজারের ডাস্টবিনের পাশে শিঙে সিঁদুর মাখানো একটা প্রকাণ্ড ষাঁড় বসে বসে জাবর কাটছে—একটি ধর্মশীলা মারোয়াড়ী মহিলা তাকে প্রণাম করে আধ সের চাল খাইয়ে গেলেন। ঠিক তার উল্‌টো ফুটপাথে একটা বে-ওয়ারিশ মড়া—দু' একজন একবার দাঁড়িয়ে দেখেই পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। স্মৃতি।

অনিচ্ছুক দৃষ্টির সামনে আর একটা হেড্‌লাইন। দণ্ডকারণ্যে পুনর্বাসন পরিকল্পনা। স্মৃতি। সন্ধ্যার আলোয় ঝলমলে লাটভবন। একশো কুড়ি-না ক'খানা ঘর আছে ওখানে। একজন মানুষের পক্ষে কতটা জায়গা দরকার ? ঈডেন গার্ডেনের আশপাশে ভাঙা টিন, ছেঁড়া ক্যান্‌ভাস্‌ আর প্যাকিং বাক্স দিয়ে গড়া ঝোপড়ী। চার-পাঁচজন করে থাকে তার ভেতর। কোথায় থাকে ? শুয়োরদের রাখলে তারাও আপত্তি করত।

উমা ফিরে এল।

—একা চুপ করে বসে আছেন ?

—না—কাগজ দেখছিলুম। —গৌতম সহজ হতে চেষ্টা করল করল: বাড়ীতে কে কে আছেন আপনার ?

—মা মারা গেছেন বছর তিনেক। আছেন বাবা, দাদা-বৌদি।

—ওঁদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবেন না ?

উমা হাসল: বাবা বাতে একেবারে পঙ্গু, বিছানা থেকে প্রায় নামতেই পারেননা। দাদা ব্যারাকপুরে একটা ব্যাঙ্কে চাকরি করে—ন'টার আগে ট্রেন ধরতে হয়। বৌদি কালীঘাটে গেছে বাপের বাড়ীতে।

—তা হলে আজ কারুর সঙ্গেই দেখা হল না। কিন্তু দমদম সেণ্ট্রাল জেলে যাবেন কেন?

উমা একটু চুপ করে রইল: আমার ভাই আছে ওখানে। সুধন্য সেনগুপ্ত।

সুধন্য সেনগুপ্ত। কপাল কুঁকড়ে এল গৌতমের। চেনা ঠেকছে নাম।

উমাই জবাব দিলে।

—হ্যাঁ—নামটা বোধ হয় শুনেছেন। সেই বি, টি রোডের পোলিটিক্যাল্ কেস্‌টার আসামী। এক সময়ে কবিতা লিখত। বাংলা দেশের জল-মাটি, ধানক্ষেত আর শিশির নিয়ে কবিতা। সবাই বলত বেশ মিষ্টি হাত।

ঠিক। মনে পড়েছে এইবার। পোলিটিক্যাল্ কেসটার চাইতেও স্মৃতিতে বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছে দুটো কবিতার লাইন:

'আমার স্বপ্নেরা হোক এক ঝাঁক নীলকণ্ঠ পাখি, নবান্নের গান গেয়ে অঘ্রাণের সোনাঝরা মাঠে'—

তারপর আর কিছু মনে আসছে না। সুধন্য সেনগুপ্তের কবিতার শিশির-জড়ানো, রৌদ্র-ছড়ানো একটা অনুভব আছে মাত্র—একদিন নিজের সঙ্গে তার সুব মিলেছিল।

উমার চুপ করে ছিল, হয়তো সে-ও সুধন্যের কবিতার কথাই কথাই ভাবছিল। আস্তে আস্তে বললে, ওর বন্ধুরা ওকে রোমান্টিক্ বলত—বলত ব্যাক্‌ডেটেড্। ওদের কেস্‌টাও নাকি রোম্যান্টিক্ অ্যাড্‌ভেঞ্চারিজ্‌ম্। হয়তো তাই হবে। কিন্তু দেশকে ও সত্যিই

ভালোবাসে। বাংলা দেশের ফুলে ভরা পদ্মদীঘি, চাষীর ঘর-আলো-করা ধানের মরাই, পুরোনো শিবমন্দিরে আরতির ঘণ্টা, মাঠে মাঠে প্রজাপতি ধরে বেড়ানোর আনন্দ—কলকাতার এই গলিতে বসে ও এই সবের স্বপ্ন দেখত।

স্বপ্ন দেখত! গৌতম চমক খেলো। সেই নীল-দিগন্তের স্বপ্ন, সেই রবীন্দ্রনাথের বাংলা দেশ : 'তোমার দুয়ার আজি খুলে গেছে সোনার মন্দিরে।' সুধন্য সেনগুপ্তেরা সেই বাংলা দেশকে ফিরিয়ে আনবার কল্পনা করেছিল। এখন আছে দমদম সেন্ট্রাল জেলে। সেখান থেকে কতটুকু বাংলা দেশকে দেখা যায়—কতটুকু আকাশকে?

উমা বললে, আপনার চা আনছি।

উঠে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হয়তো চোখ দুটো মুছে ফেলা দরকার।

দেওয়ালের একটা পুরোনো ক্যালেণ্ডারের দিকে তাকিয়ে রইল গৌতম। সাঁওতালী ঝুমুরের ছবি। পেছনে কৃষ্ণচূড়োয় লালে লাল আকাশ। কিন্তু ধুলোয় আর ঝুলে ছবিটা বিবর্ণ হয়ে এসেছে। কতদিন আগেকার কে জানে! হয়তো সুধন্য সেনগুপ্তই টাঙিয়ে-ছিল ওটাকে।

রোম্যান্টিক্। সেন্টিমেন্টাল্ আবেগ। সব বিবর্ণ হয়ে যাবে। কিন্তু কিভাবে অস্বীকার করতে পারো তবুও? জীবনের সব পূর্ণতার স্বপ্নই রোম্যান্টিক। রবীন্দ্রনাথের 'রক্ত করবী।' গোর্কির 'মাদার।'

উমা ফিরে এল। চা আর বিস্কুট নিয়ে।

—শুধু আমার জন্যেই চা? আপনি খাবেন না?

—আমার বেশি চা খাওয়ার অভ্যাস নেই।

গৌতম নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিলে। টেবিলের ওপর হাত

রেখেছে উমা। আঙুলগুলোকে লক্ষ্য করতে লাগল গৌতম। দূর থেকে যা ভেবেছিল তার চাইতেও অনেক বেশি কোমল, অনেক পেলব।

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলে : আপনি সেতার বাজাতে পারেন?

উমা আশ্চর্য হয়ে চোখ তুলল : না—কেন?

—গান?

উমা হাসল : তাও পারি না। তবে ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল। ল্যাণ্ড্স্কেপ্।

ছবি। ল্যাণ্ড্স্কেপ্। অনুমান সবটা মিথ্যে নয় তবে। এই চোখ, ওই আঙুল—সম্পূর্ণ ফাঁকি দেয়না ওরা।

—এখন আঁকেন না?

উমা আস্তে আস্তে বললে, অফিসের পরে এক জায়গায় টাইপ করতে যাই। রাত আটটা পর্যন্ত। বুঝতেই পারেন, কেবল মাইনের ওপর তো আর চালানো যায় না।

আর কিছু জিজ্ঞাসা করবার নেই। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত টাইপের কাজ। আড়ষ্ট বেদনার্ত আঙুল। তখন গ্যাস্পোস্টের তুলি গলির দেওয়ালে ভূতুড়ে ছবি আঁকে।

—আপনার দেরি হয়ে গেল না তো?—উমার জিজ্ঞাসা।

—না।

পাঁচশো জোড়া মিলিটারী বুটের সাপ্লাই যাবে—তার চিঠি টাইপ করতে হয়। তার সঙ্গে আদালতের দলিল-পত্র, বেকারের চাকরির আবেদন। রঙ—তুলি—ল্যাণ্ড্স্কেপ্!

নীল দিগন্তের অধিকার কারো নেই। গৌতমেরও না।

চা-টা শেষ করে গৌতম উঠে দাঁড়ালো : আচ্ছা—আসি আজ।

পকেটের গয়নাগুলোর কথা মনে পড়েছে। সারা শরীরে বিষক্রিয়া শুরু হয়েছে আবার।

॥ ৩ ॥

অনেকক্ষণ ঘুরে শেষ পর্যন্ত গৌতম অফিসেই এসে পৌঁছুল।

আর কোথাই বা যাওয়ার জায়গা আছে তার? কোনখানে গিয়ে নিজেকে ভুলতে পারে? পাগলের মতো আর কতই বা ঘুরবে রাস্তায় রাস্তায়? তার চাইতে অফিসই ভালো। অভ্যাসের চাকায় চলতে আরম্ভ করলে খানিকক্ষণ পরে মনের কোনো বালাই থাকবে না আর। ঘানি-গাছের নিশ্চিন্ত গোরুর দিনযাত্রা।

দস্তিদার লক্ষ্য করে বললে, চেহারা অমন কেন হে? চান-টান করোনি নাকি? মুখও তো দেখছি শুকনো। বৌয়ের সঙ্গে ঝগড়া করে না খেয়ে অফিসে আসোনি তো?

গৌতম হাসতে চেষ্টা করল। এও অভ্যেস।

—না, আমার বৌ ঝগড়া করতে জানে না।

—আহা ভাগ্যবান লোক—ব্রজেন দস্তিদার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

—বৌদি বুঝি খুব ঝগড়া করেন দাদা?—অনিল মৈত্র জানতে চাইল।

—আমার সঙ্গে রসালাপে কলহই তাঁর ভাষা।

—আপনি মিষ্টি কথা বলে তাঁকে শান্ত করেন নাকি?

—গর্দভ।—ব্রজেন বিড়ি বের করলেঃ 'হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মের্ব' কাকে বলে জানিস? মিঠে কথার ইন্ধনে তিনি আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠেন। একদিন বলেছিলুম, 'প্রিয়ে—মানময়ি!' তার উত্তরে তিনি আমাকে যা বললেন—

—কী বললেন?—অনিল আবার কৌতূহল প্রকাশ করল।

—এখন তোকে বলে দিয়ে ট্রেড্ সিক্রেট ফাঁস করব কেন? ব্রজেন চটে উঠে বললে, জানবি যথাসময়ে। শনৈঃ শনৈঃ। বিয়ে কর্, হতচ্ছাড়া।

নিজের কাজে প্রাণপণে মন দেবার চেষ্টা করতে লাগল গৌতম ক্ষিদে পেয়েছে এতক্ষণে। ক্লান্ত বিপর্যস্ত মাথাটা টেবিলের উপর ভেঙে পড়তে চাইছে। কাল সারা রাত তার ঘুম হয় নি। পকেটে রুমালে বাঁধা গয়নাগুলো আছে যথাস্থানে। হাতে খোঁচা লাগছে মধ্যে মধ্যে।

এতক্ষণে বেশ ঘন হয়ে বৃষ্টি নামল। চোখ তুলে চাইল গৌতম। কাচের জানালার ওপারে ডালহাউসি স্কোয়ার। জি-পি-ওর ঘড়ি। চলতি ট্রামবাস। আণ্ডার-ওয়াটার ফোটোগ্রাফিব মতো।

আইল্‌স্ অব্ গ্রীস্। ব্লু লেগুন। উমা সেনগুপ্ত। ছবি আর আঁকে না। সন্ধ্যার পরেও টাইপ করতে যেতে হয়।

গলিতে মবা ইঁতুরটা কি পড়ে আছে এখনো? গৌতম ঠোঁট কামড়ে ধরল। কী দরকার ছিল কাল রাতে ওই নির্বুদ্ধিতা করবার? মাথায় খুন চাপিয়ে দিয়েছিল বরেন সাঁতরা।

অথচ এমন ব্যস্ত হওয়ারই বা কী ছিল? না হয় একমাস পরেই যা হওয়ার হত। এতদিন কষ্ট পেয়েছে সুমতি, না হয় আরো ক'টা দিনই পেতো। তারপর এক মাস বাদে ছুটি হলে যেখান থেকে হোক, টাকাটা যোগাড় করে সে নিতই। বিশু জোয়ার্দারের ফরমাস মত গল্প লেখার চেষ্টাও করা যেত হয়তো।

কিন্তু এখন সে কী করতে পারে? কী উপায়ে গয়নাগুলোকে মা-র বাক্সে ফিরিয়ে দেওয়া চলে? নইলে সোজা প্রিন্সেপ ঘাটে গিয়ে গঙ্গার জলে ছুড়ে ফেলে দিলেই বা কেমন হয়?

দস্তিদার আবার খকর খকর করে কাশতে শুরু করে দিয়েছে বিড়িটা তবুও ছাড়ে নি।

—দিন কতক বিড়িটা বন্ধ করুন দাদা। —অনিল মৈত্র বললে।

—ইউ শাট আপ্। বিড়ির মর্ম তুই কি বুঝবি গাধা? রবীন্দ্রনাথ কখনো বিড়ি খেলেন না—অথচ কী ঋষিদৃষ্টি দ্যাখ্—লিখলেন: 'এই করেছ ভালো নিঠুর—এই করেছ ভালো'—

টাইরাইটারে আওয়াজ উঠছে না আজ। উমা আসেনি। বাসন্তী রঙের শাড়ী পরে কপালে কুঙ্কুমের তিলক এঁকে যে ছবি আঁকত। বর্ষার ছবি। আকাশে কালো মেঘ—কদম ফুটেছে—পাখা মেলেছে ময়ূর।

—ওই আবার আসছে ধূম্রলোচনটা—দস্তিদারের চাপা গলা: জ্বালালে।

হেড্ক্লার্ক আসছিলেন। গৌতমের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়লেন তিনি।

—ওহে গৌতম!

—কী বলছেন?

—তোমার চেহারা এমন কেন হে? শরীর-টরীর খারাপ নাকি?

—আজ্ঞে না, ভালোই আছি।

—অঃ, ছুটি পাওনি বলে মন খারাপ?—হেড ক্লার্ক মিটিমিটি হাসলেন। আর সেই হাসিতে আবার গৌতমের মাথার ভেতরে চড়াং করে রক্ত ছুটে গেল খানিকটা। একটা চড় বসিয়ে দিলে কেমন হয় লোকটার গালে? চাকরিতে রিজাইন দেবার আগে অন্তত একটা ভালোমতন জবাব?

হেডক্লার্ক তেমনি হাসি মুখেই বললেন, মন ভালো করে ফেলো হে। ছোট সাহেব একটা জরুরী টেলিগ্রাম পেয়ে কাল নাগপুরে রওনা হয়েছে। যাওয়ার আগে তোমার ছুটিটা মঞ্জুর করে রেখে

গেছে।—হেড্ ক্লার্কের হাসিতে চাপা খানিকটা বিদ্বেষের জ্বালা ঠিকরে পড়ল : আর অ্যাপ্লিকেশনের ওপর কমেণ্ট করেছে, হি ইজ এ রাইটার, হিজ কেস্ ডিজার্ভস্ স্পেশ্যাল কন্‌সিডারেশন! তুমি রাইটার নাকি হে! জানতুম না তো।

দাঁড়িয়ে উঠতে গিয়েও আবার ধপ করে বসে পড়ল গৌতম। মনে হল, জীবনে এমন ঠাট্টা তাকে কেউ কোনোদিন করেনি।

এইবার?

ছুটি না পেলে মা-র গয়নাগুলো যেমন করে হোক ফিরিয়ে দিত বাক্সের ভিতর। কিন্তু এখন? অফিসের সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে গৌতম ভাবল, এখন?

টাকা তাকে জোগাড় করতেই হবে। এবার আর তার ফিরে যাওয়া চলে না। ছুটি পাওয়া গেছে, টাকার জন্যে আটকে থাকবে? আবার সেই প্রলোভন। পকেটের গয়নাগুলো—

ক্ষিদেয় তেষ্টায় মাথা ঘুরছে। বেরিয়ে সেই বৌবাজার। আবার সেই অসহ্য স্নায়বিক সংগ্রাম। তেমনি করে গিয়ে গয়নার দোকানের সামনে দাঁড়াবে—দ্বিধায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবে, তারপরে পালিয়ে আসবে সেখান থেকে। নিজেকে বলবে : পারব না—কিছুতেই পারব না?

গৌতম ফুটপাথে এসে দাঁড়ালো। চোখ দুটো ধোঁয়া-ধোঁয়া। কাল সারা রাত ঘুম হয়নি—শরীর এখন ভালো করেই তার জানান দিচ্ছে। মনে হচ্ছে, এইখানেই সে পথের ওপর এলিয়ে পড়ে।

সেই বৌবাজার? সেই অদ্ভুত অক্ষমতার যন্ত্রণা? একটা অদৃশ্য নিষেধের নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ?

আড়ষ্ট অনিশ্চিতের মতো ফুটপাথের দিকে এগোচ্ছে, ঠিক সেই সময় গাড়িটা এসে দাঁড়িয়ে গেল পাশে।

– ঠিক ধরেছি! আর একটু হলেই মিস্ করতুম। একেই বলে লাক্।

বরেন সাঁতরা। একগাল হাসি তাঁর মুখে।

গাড়ীর দরজা খুলে দিয়ে বরেন বললেন, উঠে পড়ুন স্যার।

—তার মানে?

—আপনার বাসায় মিস্টার জোয়ার্দার বসে রয়েছেন। মিসেস্ সান্যাল বললেন, আজ বাড়ী থেকে খেয়ে বেরোননি—কোথায় বাইরে যাওয়ার কথা—খুব ব্যস্ত আছেন। ভাবলুম অফিস থেকে হয়তো আর কোনো দিকে চলে যাবেন—ধরতে পারব না। কিন্তু ঠিক টাইমলি এসে পড়েছি। উঠুন—

বোকার মতো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল গৌতম।

—ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না তো?

—ব্যাপার আবার কী। সেই কণ্ট্রাক্ট। গাড়ীতে উঠুন—বলছি।

সেই দুর্বোধ্য নাটকে নির্বোধের ভূমিকা। গৌতম মোটরে উঠে পড়ল। নিজের ইচ্ছেয় তার কিছুই করবার নেই। অথবা, অভিনেতাও নয়। পুতুল নাচের পুতুল। কার খেয়ালী হাতের সঙ্গে সূতো দিয়ে যে বাঁধা—সে তা ভাবতেও পারে না।

গাড়ী চলতে লাগল। বরেন সাঁতরা বলে চললেন, ওঃ কাল আপনার কী চোখের অবস্থা স্যার। দেখে আমরা ভয় পেয়েই গেলুম। রাইটারেরা এমন সেন্টিমেন্টাল হয়! মিস্টার জোয়ার্দার বললেন, হি ইজ পার্ফেক্‌ট্‌লি রাইট—এভাবে লোককে ল্যাজে

খেলানোর কোনো মানে হয় না। চলুন তো—একবার সাহার কাছে যাওয়া যাক এখুনি। ছুটে গেলুম আমরা। স্যার, তখন জোয়ার্দারের মূর্তি যদি দেখতেন! সাহা কেবল বলে, আরে, আপনি এত সিরিয়াস হচ্ছেন কেন? জোয়ার্দার বললেন, আপনার যা খেলা—অন্যের তা মৃত্যু।

গৌতম কথা বললে না। অভিভূত হয়ে বসে রইল।

—তখনই সব ঠিক হয়ে গেল। কন্ট্রাক্ট পেপার থেকে শুরু করে টাকা—সব কিছুরই ব্যবস্থা করা গেল। আমরা একেবারে ক্যাশ মানি নিয়ে এসেছি। এখন পাঁচশো এক, স্ক্রীপ্‌ট শেষ হয়ে গেলে—

গৌতম বাইরের দিকে তাকালো। রোদ উঠেছে—একটা অপরূপ সোনালি আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। কলকাতা সুন্দর হয়ে উঠেছে। আকাশ স্নিগ্ধ নীল। একটুকরো মেঘের ওপর সোনালি রোদ জ্বলছে—ওই তো ফুলের আগুন লেগেছে ওখানে।

সাঁতরা বললেন, একটা সিগারেট খাবেন?—সাঁতরার কিছুতেই মনে থাকে না যে, গৌতম সিগারেট খায় না।

গৌতম বলতে যাচ্ছিল, আমি তো, কিন্তু তার বদলে বললে, আচ্ছা—দিন একটা।

॥ ৪ ॥

আঃ—আরো, আরো তাড়াতাড়ি।

ট্যাক্সি ছুটছে। সুমতির হাত মুঠোর মধ্যে ধরে গৌতম বললে, সর্দারজী, জেরা জল্‌দি যাইয়ে—

ট্যাক্সি ড্রাইভার মুখ ফিরিয়ে হাসল ঃ ঘাবড়াইয়ে মাৎ বাবুজী। গাড়ী জরুর মিল্ যায়গী। বহুৎ দের্ হ্যায় আভিতক।

দুপাশে আলো ছুটছে—ট্যাক্সি ছুটছে। হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল গৌতম। এখনো আধ ঘণ্টা। বিশ্বাস নেই তবুও। বড়বাজারে 'জাম্' হতে পারে—টিকিট কেনার ঝামেলা আছে—তারপর একটু আগে না গেলে গাড়ীতে জায়গা পাওয়াও মুস্কিল হবে।

অল্প একটু প্রসাধনেই কত সুন্দর দেখাচ্ছে সুমতিকে। চলন্ত ট্যাক্সির একটুখানি খোলা বাতাস লেগেই যেন তার চোখে মুখে সুস্থতার ছায়া পড়েছে খানিকটা। সুমতির কয়েকটা শীর্ণ আঙুল মুঠোর মধ্যে চেপে ধরে গৌতম ভাবতে লাগল—এই ক'টা দিনেই ভালো হয়ে যাবে সে, আবার নতুন করে রঙ ধরবে তার গালে, ফিরে এসে আবার ধূলো-জঞ্জালের মাঝখানে থেকে এস্রাজটাকে উদ্ধার করাও হয়তো অসম্ভব নয়।

লাল আলো চোখ রাঙিয়েছে। ট্যাক্সি থামল।

—আঃ, এই ট্রাফিক সিগ্‌ন্যালের জ্বালায়—

সুমতি আস্তে আস্তে প্রায় বিষণ্ণভাবে বললে, আসবার সময় মা কেমন কাঁদছিলেন, দেখেছ ? আমাকে এত ভালোবাসেন আগে যেন বুঝতেই পারি নি।

গৌতম মাথা নীচু করল। সংমা! কাল সারারাত ওই কথাটাই সে ভাবতে চেষ্টা করেছিল।

কিন্তু সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করবে ফিরে গিয়ে। আপাতত কেবল একটা সান্ত্বনা। মা যখন সুমতির বাক্স গুছিয়ে দিতে ব্যস্ত, সেই ফাঁকে সে গিনি আর গয়নাগুলো রেখে দিতে পেরেছে যথাস্থানে। কাল রাত্রির চিহ্ন তার স্মৃতি ছাড়া আর কোথাও রইল না।

আলোচনার মোড় ঘুরিয়ে দেবার জন্যে গৌতম বললে, "রাতের তারা" ভালো ছবি হবে—না?

—নিশ্চয় হবে। খুব ভালো হবে।—সুমতি খুশিতে চঞ্চল হয়ে উঠল: আমাকে একদিন শুটিং দেখাবে না তোমার ছবির?

—দেখাব বই কি। তুমি না দেখলে কি চলে? তবে তো ছবিই হবে না। আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে কথাটা বলতে ভারী ভালো লাগল। চমৎকার শোনালো কানে।

গাড়ী চলছে। হাওড়ার ব্রীজ। গঙ্গার ঠাণ্ডা হাওয়া। নীচের কালো জলের ওপর বহুরূপী আলোর মালা দুলছে।

মুক্তি। গঙ্গা চলছে সমুদ্রে। অন্তহীন নীলের ভেতরে।

মুক্তি!

এই কলকাতায় ফিরে আসতে হবে আবার। আবার এই জীবনে। কিন্তু সুমতি বেঁচে উঠুক। তা হলে এরই মধ্যে অমৃতের স্বাদ খুঁজে পাবে গৌতম। এত তিক্ততার ভেতরেও মনে হবে, এখনো আশা আছে, এখনো সব ফুরিয়ে যায় নি; যেদিন আকাশে মুঠো তুলে দাবি জানাতে হবে—সেদিন অনেক বেশি জোর, অনেক বেশি প্র্যতয় নিজের ভেতরে অনুভব করবে গৌতম। সূর্য তেজ দেবে, বাতাস শক্তি দেবে, মাটি প্রেম দেবে।

ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনে এসে ঢুকছে। ট্রাম বাস ট্যাক্সির অরণ্য। শব্দের ঝড়। সমুদ্রের গর্জন।

তারপর একটা নিরবচ্ছিন্ন ঘূর্ণি। কুলি। টিকেট। গেট। ভিড়। ট্রেণ। ভিড়।

তবু সব কোলাহল আজ ঐকতান। সব ধ্বনি ঝঙ্কৃত। প্ল্যাটফর্মের আলোগুলোর রঙ যে এমন অপরূপ তা কে জানত! নিজের হাত পাগুলোকে পর্যন্ত অচেনা মনে হয়। নিয়নের মায়ায় সব অবাস্তব হয়ে গেছে।

—কী ভিড়! কী ভিড়!

—এত লোক গাড়ীতে উঠে পড়েছে, আমরাই পড়ে থাকব? সুমতির উৎসাহিত সান্ত্বনা।

না, পড়ে থাকতে হল না। কুলি ঠিক তুলে দিয়েছে। একেবারে সামনের দিকের একটা থার্ড ক্লাসে। আঃ—যেন দুর্গ জয় শেষ হল এতক্ষণে। গাড়ী বোঝাই—তবু অন্তত উঠবার জায়গা পাওয়া গেছে।

ওপাশের একটি হিন্দুস্থানী মহিলা সুমতিকে জায়গা করে দিলেন। ঠেলে-ঠুলেই। মেয়েরা সহৃদয়া। এক কম্বলে অনেকের জায়গা হয় ওঁদের।

দরজার পাশে নামানো ট্রাঙ্কের ওপরই বসে পড়ল গৌতম। আপাতত এর বেশি আর আশা নেই। এইটুকুও সৌভাগ্য। মাঝ পথে যদি একটুখানি খালি হয়—দেখা যাবে তখন। সুমতি ব্যথিত চিন্তিত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাচ্ছে বার বার। মৃদু হাসিতে গৌতম তাকে আশ্বাস দিলে। তার জন্যে ভাবনা নেই, সে এতেই বেশ আছে।

বীভৎস গরম। সারা গা দিয়ে কাল রাতের মতো ঘামের স্রোত নামছে। আজ ওই ঘামে যেন শরীর জুড়িয়ে গেল।

আজকাল তো থার্ড ক্লাসে পাখা দিচ্ছে—এ গাড়ীতে নেই কেন ? তা না থাক। ট্রেণ ছাড়লেই হাওয়া দেবে এখন।

সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে। তবু আজ ফেরিওলার কাছ থেকে এক বাক্স কাঁচি সিগারেট কিনল গৌতম। একটা ধরালোও। সুমতির চোখে শাসন ফুটল দূব থেকে : ওসব খাচ্ছ কেন আবার ? তোমার তো অভ্যেস নেই।—গৌতম হাসল। আজ সব অন্য রকম। একটু ব্যতিক্রম নয় ঘটলই। সুমতির শাসনকে আজ আব তার ভয় নেই।

তারপর সিগারেট ধরিয়ে, এই তিন দিনের স্নায়ুছেঁড়া অবসাদে সে গাড়ীর দেওয়ালে মাথা এলিয়ে দিলে। চোখের পাতাদুটো জড়িয়ে আসছে। আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছে, এর মধ্যেই হিন্দুস্থানী মেয়েটির সঙ্গে গল্প জমিয়ে নিয়েছে সুমতি। মেয়েবা অনেক সুখী।

বোধ হয় এই ভিড় আর গোলমালের মধ্যেই ঝিম এসেছিল, গাড়ী ছাড়ার ঘণ্টার শব্দে চমকে উঠল গৌতম। আর তখনই শোনা গেল বহু-পরিচিত প্রার্থনা : বাবু—একটা পয়সা দিয়ে যাবেন গরীবেরে।

অবগুণ্ঠিতা একটি মেয়ে। খোলা দরজাব মধ্যে একখানা প্রসারিত হাত। রক্তহীন, কতকগুলো শীর্ণ কদাকাব আঙুল। কী ভেবে হঠাৎ উঠে গেল দরজার কাছে। তারপর কেউ দেখবার আগে মেয়েটির হাতে গুঁজে দিল একখানা নোট। পাঁচ টাকার নোট।

চমকে উঠল মেয়েটি, সঙ্গে সঙ্গে চমকে উঠল গৌতম নিজেও। এ সে কী করে বসল ? কোনো মানে হয় এর ? দুটো পয়সা দিলেই তো দু হাতে আশীর্বাদ করে চলে যেত। কেন এ পাগলামি করতে গেল অকারণে ?

আশীর্বাদ দূরে থাক, কথাই বলতে পারল না মেয়েটা। কেবল দু চোখে ভয় আর অবিশ্বাস মেলে চেয়ে রইল গৌতমের দিকে। সচকিতে সরে এল গৌতম, দড়াম করে বন্ধ করে দিল দরজাটা।

ট্রেণ চলতে সুরু করেছে। আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে সার-বাঁধা প্ল্যাটফর্মের আলো। গাড়ীর চাকার সুর উঠেছে। অনিল মৈত্র গান গাইছে যেন। "নীল দিগন্তে ওই"—

উমা সেনকে মনে পড়ল।

সুধন্যের স্বপ্ন মিথ্যে হবেনা। উমাও আবার ছবি আঁকবে। পৃথিবীর রঙের ভাণ্ডার শূন্য হয়ে যায়নি—আজ শুধু আমরা তার চাবিটাই হারিয়ে ফেলেছি। কিন্তু খুঁজে পাব। পাবই একদিন।

সুমতি চেয়ে আছে গৌতমের দিকে। আনন্দে, কৃতজ্ঞতায় ঝলমল করছে চোখ। সেই মেয়েটির দৃষ্টিও এতক্ষণে বদলে গেছে নিশ্চয়। সে চোখেও কৃতজ্ঞতার ঢেউ উঠেছে।

আজ সারারাত ধরে ট্রেণের হাওয়ায় সমুদ্রের খবর আসুক। আকাশের তারাগুলো কোনো হিল্ স্টেশনের আলোর মতো জ্বলতে থাকুক। তারপর কাল সকাল। উমা সেনের ল্যাণ্ড্স্কেপ্। ঝাঝার নীল দিগন্তে সূর্য উঠবে তখন॥